A-PDF Image To PDF Demo. Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

বহ্নি বলয়

নীলিমা ইব্রাহিম

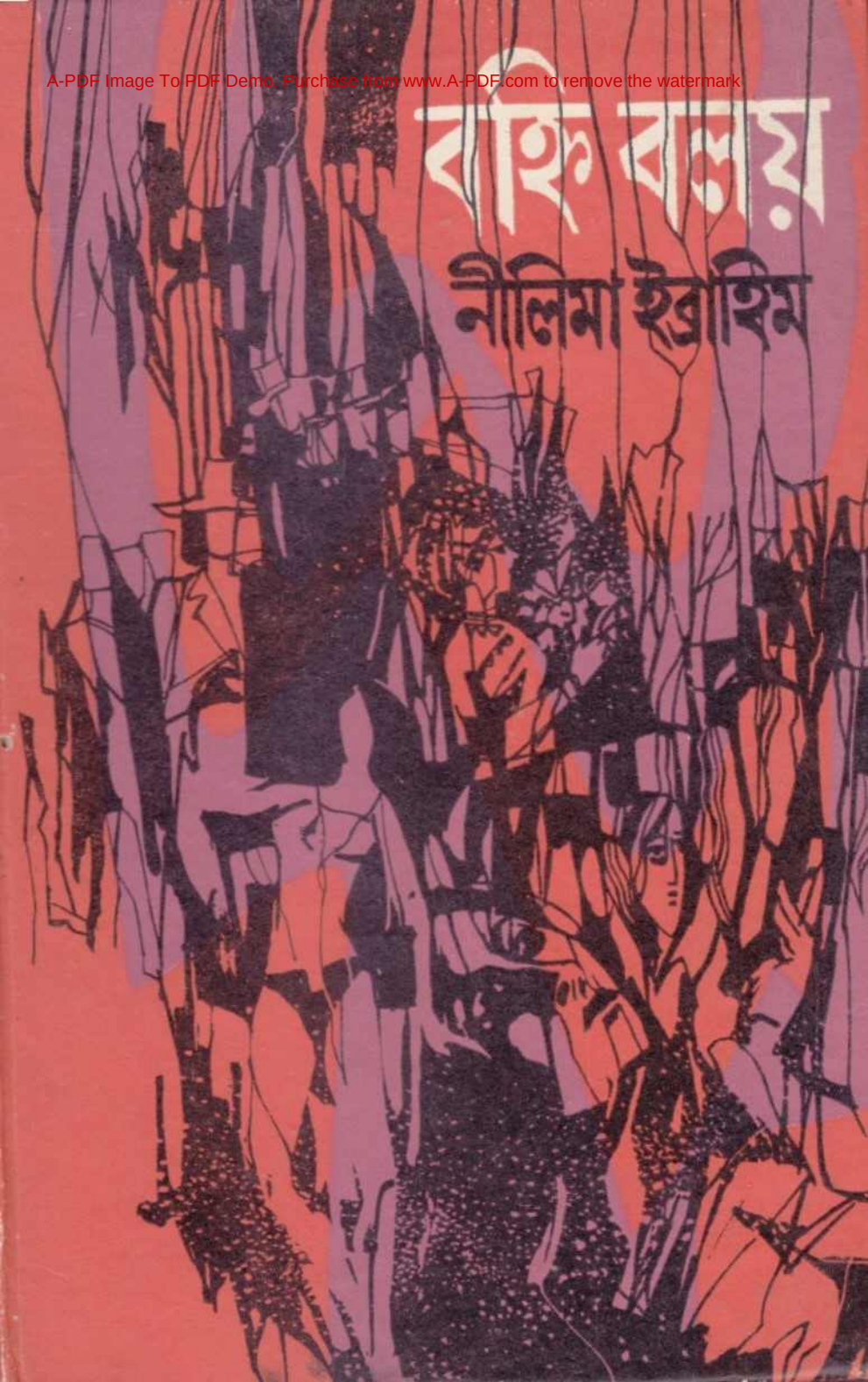

বহ্নি বলয়

নীলিমা ইব্রাহিম

মুক্তধারা

মুক্তধারা ৯১৯

প্রকাশক ঃ
চিত্তরঞ্জন সাহা
মুক্তধারা
[স্বঃ পুথিঘর লিঃ]
৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১
বাংলাদেশ

প্রথম প্রকাশ ঃ মার্চ ১৯৮৫
প্রচ্ছদ-শিল্পী ঃ হাশেম খান

মুদ্রাকর ঃ
প্রভাংশুরঞ্জন সাহা
ঢাকা প্রেস
৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১
বাংলাদেশ

মূল্য ঃ সাদা ঃ ১৭·০০ টাকা
লেখক কাগজ ঃ ১৩·০০ টাকা

BANNI BALAYA
[A Travelogue]
By Nilima Ibrahim
First Edition : March 1985
Cover Design : Hashem Khan
Publisher : C. R. Saha
MUKTADHARA
[Prop. Puthighar Ltd.]
74 Farashganj, Dhaka-1
Bangladesh
Price : Whiteprint : Taka 17·00
Lekhakprint : Taka 13·00

উৎসর্গ

মামণিরা, তোমাদের সংগ্রামী জীবনে
আমার অভিনন্দন গ্রহণ করো
মামণি

যে কথা বলবো বলবো ক'রে বলা হ'য়ে ওঠেনা, তা নিরন্তর প্রকাশের তাগিদ দেয় মনকে। এ এক অব্যক্ত বেদনার অনুভূতি। তাই যে কাহিনী লিখবো লিখবো ক'রে সাত আট বছর পার ক'রে দিলাম তাও অহর্নিশি আমাকে অন্তর্জ্বালায় দগ্ধ করছে। কারণ ওমর খৈয়ামের মতো আমরা সম্পূর্ণরূপে নিজেকে ভাগ্যের হাতে সমর্পণ করতে পারিনা, সে-বিশ্বাস বা দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞান আমাদের সাধারণ মানুষের নেই। তাই কে, কোথায়, কখন কি ক'রে বসি তার অনুমাত্র আভাস ইঙ্গিতও পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আমাদের মনের কোণে উঁকি দেয়না। মনোরাজ্যের এ এক অপার অতলান্ত রহস্য।

নিষিদ্ধ ফলের প্রতি আমাদের অর্থাৎ মানবগোষ্ঠীর আকর্ষণ উত্তরাধিকার-সূত্রে। কারণ এই পাপ স্পর্শে একদিন স্বর্গ সৃষ্টি করে-ছিলেন আমাদের আদি জনক জননী। জল আমাকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করে। কারণ আমার বয়স যখন বছর ছয় সাত হবে তখন সঙ্গীদের সঙ্গে নাইতে গিয়ে জলে ডুবে গিয়েছিলাম। পাতাল-পুরীর অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেটার' মত আমারও কিঞ্চিৎ হয়েছিল। বুড়োবয়সে ডাক্তার অস্ত্রোপচারের জন্য যখন ক্লোরোফর্ম দিচ্ছিলেন তখন আরেকবার সে সুখস্পর্শ পেয়েছিলাম। যাই হোক বাড়ির ভেতর সীমায় পুকুর ; ছাদ থেকে দেখতাম ভাই-বোনেরা অপার আনন্দে সাঁতার কাটছে। পরবর্তীতে মামাবাড়ির বারান্দার চিকের ছেঁড়া টুকরো খুঁটতে খুঁটতে দেখেছি ছোটভাই কুমারটুলীর গঙ্গার ঘাট থেকে সাঁতরে এপার ওপার করছে। কিন্তু আমার আর সাঁতার কাটাই হলোনা ; অবগাহন স্নান কাকে বলে জানলাম না। কারণ ও এলাকা আমার জন্যে চিরতরে নিষিদ্ধ রয়ে গেল। অবশ্য কলেজ জীবনে যখন নিজের দায় নিজেই বইতে পারি বলে ধারণা জন্মেছে তখন কলেজ-তত্ত্বাবধানে সুইমিংপুলে গিয়েছিলাম আজন্মের সাধ মেটাতে। কিন্তু বিধি বাম। আমার ইঙ্গবঙ্গ সাঁতার শিক্ষকের

আগ্রহ যতোনা সাঁতার শেখাবার ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশী ছিল রমণী-দেহ স্পর্শের। তাই সেই শেষ সম্বলও হাতছাড়া হয়ে গেল।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় পুকুর, নদী, হ্রদ, সাগর, মহাসাগর আমাকে গভীরভাবে চুম্বক-আকর্ষণ করে। ঘন্টার পর ঘন্টা দেশ বিদেশের সমুদ্র সৈকতে কাটিয়েছি—তার গর্জন শুনেছি, নীরব গভীর জীবন-দর্শনের ইঙ্গিত পেয়েছি। পেয়েছি মহাকালের ছোঁয়া। এ বাংলায় স্থায়ীভাবে বসবাস করবার পর আমার এমন একটি বছর যায়নি যে কক্সবাজারের সমুদ্রের সঙ্গে মিতালি করিনি। অল্পদিন আগেও আলেকজাণ্ড্রায় হোটেল প্যালেস্টাইনের সর্বশেষ সিঁড়িতে ভূমধ্যসাগরের জলে পা ডুবিয়ে বসে থেকেছি দুপুর থেকে সন্ধ্যা। বান্ধবী লায়লা বলেছিল, 'আর জলকেলি করলে রাতের আগে কায়রো পৌঁছা-নো যাবেনা। পথে রাত হলে অসুবিধা আছে।' বলি, 'সুন্দরী কুলি ভাড়া দিয়ে এ বোঝা কে নেবে বলতো। তবে হ্যাঁ, তোমার দিকে তাকিয়ে আমাকে উঠতেই হবে, কারণ লায়লা সত্যিই লায়লা।' কিন্তু ওঠবার সময় মনে হচ্ছিল ভূমধ্যসাগরের তীরস্পর্শী ঢেউ আমায় বলছে, আরেকটু থাকো। আরও কথা আছে। ভূমার রহস্য আমার বুকে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওঠতে হয়েছিল। বাল্টিক সাগরের বুকে ভেসেছি। তীরে তাঁবুতে থেকেছি। তবুও সাগর দেখার আকাঙ্খা, পিপাসা আমার নিবৃত্ত হয়নি।

হাঙ্গেরীর নীল স্নিগ্ধ লেকের রূপে মুগ্ধ হয়ে বলাকার পরি-কল্পনা রবীন্দ্রনাথ কি এখান থেকেই পেয়েছিলেন? 'ঝিলাম' কি উপলক্ষ্য মাত্র। সেই গভীর নীল জলরাশি আর তার বুকে অসংখ্য শ্বেতশুভ্র বলাকা শ্রেণী—চোখ বন্ধ করলেই এখনও উপলব্ধি করি। রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে হাতস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য ওখানে কিছু-কাল ছিলেন। বাড়িটি আজ 'টেগোর মিউজিয়াম'। কবির হাতে রোপিত লেবুগাছ আজ বিরাট মহীরুহ, পাদদেশে কবির আবক্ষ মর্মর মূর্তি আর চারটি চরণ কবিতা। কবির যোগ্য বাসস্থান। কিন্তু আমি যে পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত নির্ভেজাল গদ্য, আমার কেন এমন হয়। বাড়ির কাছে আয়না সাগর, ফুলপাতা, পচা নারকেল ভাসমান পূতিগন্ধময় পুষ্কর—তারই সৌন্দর্য কি কম!

ভূমিকা দীর্ঘ হয়ে গেল। তবে বর্তমান কাহিনীতে পৌঁছাতে আমার নিজের মনোভূমির পরিচয় প্রয়োজন। ১৯৭৫ সালের মধ্য জুলাই হাওয়াই সমুদ্রতীরে বসে আছি। সঙ্গে অরণ্যবিস্তৃত উদ্যান, অসংখ্য সিঁড়ি জলকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে ফেলছে। আমার সফর-সঙ্গিনী একটি ভর যুবতী আমেরিকান কন্যা, নাম এ্যান্, উচ্চ শিক্ষিতা, মার্জিত রুচিসম্পন্না। ক'দিন থেকেই ও সাঁতার কাটবার মৃদু বাসনা প্রকাশ করেছিল কিন্তু আমি উদয়াস্ত এতো ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম যে আমার কাছে মুখ ফুটে কথাটা বলতে ও সঙ্কোচ বোধ করছিল। অবশ্য বেশীর ভাগ সময়ই ওর অবসর, কারণ ঘুরেছি আমি একাই, কিন্তু অতন্দ্র কর্তব্যনিষ্ঠ হোটেলেই আমার জন্য অপেক্ষা করতো, যদি কোনও প্রয়োজন হয়।

একদিন বিকেলে দেখলাম রাস্তার দু'পাশে অসম্ভব ভিড়। ব্যাপার কি? আমেরিকার দুইশত বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে শোভাযাত্রা যাবে এ পথে। মন কৌতূহলী হ'ল। কি ধরনের শোভাযাত্রা? ওয়াশিংটন, ন্যুইয়র্ক, সানফ্রান্সিসকো সর্বত্রই 'হরেকৃষ্ণ হরে রামের' শোভাযাত্রা দেখেছি। রসকলি কাটা বৈষ্ণবী আর চার ইঞ্চি খড়মের হিলের সঙ্গে ছ'ইঞ্চি টিকির সমাবেশ যত্রতত্র। মনে হয় কেষ্টঠাকুর মাইগ্রেট করেছেন এদেশে। যাই হোক এত লোক নিশ্চয়ই সে কারণে সমবেত হয়নি। সন্ধ্যা ছ'টা সাড়ে ছ'টা হবে। সূর্যের আলো যথেষ্ট আছে। তবে ফ্যাকাশে হলুদ। গোলাপী আভা আসতে প্রায় ঘন্টা দুই বাকি। শুরু হ'ল শোভাযাত্রা। সব ক'টি রাজ্যের বিভিন্ন পোশাক বৈচিত্র্য নিয়ে নাচনেওয়ালা, গানেওয়ালা, বাদ্য-যন্ত্রী এবং সুন্দর করে সাজানো গাড়ি জীবজন্তু অথবা পত্রপুঞ্জের প্রতিকৃতি নিয়েচলেছে। তন্ময় হয়ে দেখছি। মুহুর্মুহু করতালিতে পরিবেশ মুখর।

তারপর যখন সব প্রায় শেষ তখন হোটেলে ফিরবার তাগিদ অনুভব করলাম। কারণ জঠরে তখন মূষিক শাবক দৌড় প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত। ঘুরে দাঁড়াতেই এ্যান বললো, 'তুমি এতোই উপভোগ করছিলে যে তোমাকে ডাকতে আমার সঙ্কোচ হ'চ্ছিল।' বল্লাম 'বেশ তো ভালই লাগছিল। চলো এবারে।' ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি সাড়ে এগারোটা। সর্বনাশ হোটেলের ডাইনিং হলতো অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। কাছাকাছি রেস্তোরাঁগুলোও

মনে হ'ল ঝাঁপ গুটিয়েছে। অপ্রস্তুতভঙ্গীতে ব'ল্লাম, 'আমার জন্য ভাবিনা, লাউঞ্জ থেকে কড়ি ফেলে কোক নিয়ে ঘরে যাবো, কিন্তু তুমি সোমাত্ত মেয়ে, উপোস দেবে কি করে?' কথা বলতে বলতে হোটেলে এসে গেছি। এ্যান বললো, 'প্রফেসর, তুমি ঘুমিওনা, আমি দেখি কিছু খাবার পাই কিনা?' আমি ওর হাত চেপে ধরলাম। মেয়ে বলে কি? এতো রাতে এই হনুলুলুর পথে খাবার খুঁজতে যাবে এই সুন্দরী যৌবনবতী রূপসী। সে যে কোনও নরখাদকের খাদ্যে পরিণত হতে পারে। তাছাড়া, ক'দিন ধরে দেখছি জায়গাটা অল্পবয়সীদের জন্য তেমন সুবিধার না। ও আমার হাত আলগা করে আস্তে বললো, 'আমি জানি তুমি আমাকে মেয়ের মতই ভাবো, তাতে আমি গর্বিত। কিন্তু আমি তোমার বাংলাদেশের মেয়ে নই প্রফেসর, আমি আমেরিকার মেয়ে, জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের অধিকারী। তুমি ঘন্টাখানেক পরে শুতে যেয়ো। আমি যতো তাড়াতাড়ি পারি ফিরবো।' দ্রুত চলে গেল এ্যান আর আমার জন্যে রেখে গেল প্রচুর সংখ্যক হৃদপিণ্ডের দ্রুত লয়ে উত্থানপতন। পরের মেয়ে শুধু আমাকে রাতে না খেয়ে থাকতে দেবে না বলে এই গভীর রাতে গেল কোথায়? তাহ'লে নারী-চিত্ত কি দেশকালের গণ্ডি মানে না। কোনও দিন রাতে রাগারাগি করে খেতে না চাইলে ঠাকুমা বলতেন, 'যা খেয়ে আয়। জানিস না রাতউপোসী হাতিও শুকিয়ে যায়।'

বারোটা বেজে দশ মিনিট, দরজায় টোকা পড়লো। দু'টুকরো ভাজা মুরগী আর দুটো কোক নিয়ে এ্যান হাজির। আমার ভাগ আমার হাতে তুলে দিয়ে বললো, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তোমাকে না খাইয়ে রাখতে হ'ল না। অনেক রাত হয়ে গেছে, শুভরাত্রি।' দরজা বন্ধ হয়ে গেল। আমি মুরগীর টুকরোর স্বাদ থেকে বেশী উপভোগ করলাম এ্যানের কর্তব্যনিষ্ঠা। বড় ঘরের মেয়ে। নিউজার্সী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ওর বাবা। ভাই নামকরা সাংবাদিক; অথচ মেয়েটি কতো সহজ, সরল, অনাড়ম্বর আর কর্তব্যপরায়ণ।

পরদিন সকালে বেরিয়ে গেলাম অন্য একটি দ্বীপে এক পরিবারের আমন্ত্রণে। তাদের ফুলের ব্যবসা। আমেরিকার বিভিন্ন এয়ার লাইনসে ফুল সরবরাহ করে জনসন পরিবার। কর্তা জেট পাইলট।

দেখা হ'ল অল্প সময়ের জন্য। দু'হাতে জড়িয়ে গালে উষ্ণতার গুশ দিয়ে বিদায় নিলেন। এ এক আশ্চর্য পরিবার। পাশাপাশি দুটো বাড়ি। একটাতে থাকেন আশি বছরের বৃদ্ধ মা, অন্যটায় জনসন দম্পতি ও তাঁদের দু'টি ছেলেমেয়ে। পরিবারটি ভারতীয় জীবন দর্শনে মুগ্ধ। প্রতি বছর ওদের ওখানে একজন স্বামীজী যান এবং সেই উপলক্ষে বহু লোক সমাগম হয় তাঁদের বাড়িতে। অনেকটা আমাদের ওরসের উৎসবের মতো। খানাপিনা, আনন্দ উৎসব, গান বাজনা তত্ত্বকথা সবই হয়। প্রসঙ্গক্রমে গৃহকর্ত্রী বললেন তাদের বাড়িতে কোনও তালাচাবির ব্যবহার নেই। প্রতিবেশীরা সবাই এ খবর জানে। কিন্তু কখনও তাঁদের বাড়িতে চুরি হয়নি। কারণ তাঁরা বিশ্বাস করেন অন্যকে না ঠকালে তাঁদের ধনও কেউ স্পর্শ করবে না। আমার জটিল কুটিল মন একে সহজ ভাবে নিতে পারলো না, কারণ যাঁরা একটা দ্বীপের মালিক, অর্ধ পৃথিবী ব্যাপী ব্যবসা চলছে একমাত্র তাঁরাই বোধ হয়, এ সততার বিলাসিতা উপভোগ করতে পারেন। উপরন্ত প্রতিবেশীরাও দরিদ্র নয়।

যাই হোক আমাকে আমন্ত্রণ জানাবার কারণ তাঁরা জানতে পেরেছিলেন আমি টেগোরের দেশের লোক এবং টেগোরের ভাষায় সাহিত্য চর্চা করি। টেগোর প্রীতির কারণ জানালেন 'টুটু' অর্থাৎ বৈমানিক জনসনের মা। সে দিন ভাবের ঘোরে 'টুটু' শব্দটির মানে জানা হয়নি, হয়ত বা কোনও অর্থ নেই। এটাই ওঁর নাম। কারণ বৌ, নাতি, নাতনী, সবাই ওঁকে টুটু বলেই সম্বোধন করছিল। টুটু নিজে হাওয়াইয়ান কিন্তু বিয়ে করেছিলেন এক সুইডিশ রূপবান তরুণকে। তাঁর বিয়ের ছ'মাস পর টেগোর এসেছিলেন হাওয়াই দ্বীপে। টুটুর হাতের গাঁথা মালা টেগোর পরেছিলেন। গ্রন্থনার প্রশংসা করেছিলেন। টুটুর সমস্ত মুখখানা এক সলজ্জ আনন্দে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠলো। বল্লেন, তাঁর ফুলের কারবার সেদিনই সার্থক হয়েছিল। ষাট বছর পেছনে ফেলে আসা বৃদ্ধার মুখের দিকে আমি বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিলাম। সেখানে এক আলো আর রঙের খেলা। কবি রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর বহুদেশে বহু প্রেমিকা নারীর সঙ্গ-লাভে ধন্য হয়েছেন। তাঁর ছিল এক সম্মোহনী শক্তি, টুটুও আবেগে উদ্বেল হয়েছিলেন সেদিন। স্বামীকে বলেছিলেন, 'ওগো তুমি আমার

জীবনে কেন ছ'মাস পরে এলেনা, আমি তাহলে টেগোরের সঙ্গে ভারতবর্ষে চলে যেতাম।' না, মাথা নাড়লেন টুটু। ভারতবর্ষে তাঁর আর যাওয়া হয়নি। একটি ছেলে রেখে স্বামী অল্প বয়সেই মারা যান। সন্তানের দায় দায়িত্ব তাঁর ওপর পড়ে, উপরন্ত ছিল পিতৃধন ফুলের ব্যবসা। আজ তাঁর অনেক অর্থ, কৃতি সন্তান। কিন্তু এ বয়সে ভারতে যাবার ক্ষমতা তাঁর নেই, উপরন্ত টেগোরহীন ভারত তাঁকে কি দেবে? এবারে আমার অবাক হবার পালা। রবীন্দ্রনাথের গানকে জাতীয়সঙ্গীত রূপে পেয়েও কি আমরা টেগোরকে এতোখানি ভালবাসতে পেরেছি। ঘর থেকে গীতাঞ্জলি বের করে আনলেন। দু'একটি গানের বাংলা আমি আবৃত্তি করলাম। টুটু চোখ মুছলেন।

মিসেস জনসন আমাদের সঙ্গে নানা বিষয়ে গল্প করলেন। তাঁর ফুলের ব্যবসা সম্পর্কিত পেপার কাটিং আমাকে উপহার দিলেন, সঙ্গে একটি সাদা ফুলের মালা। টুটু খাবার গুছিয়ে আনলেন। গল্পে গল্পে দিনটা শেষ হয়ে এলো। যাবো অনেক দূর। টুটু আমাকে শক্ত করে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তিনি কি টেগোরের দেশের স্পর্শ পেতে চাইলেন! আমার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো, মুখ তুলে দেখলাম ওঁর চোখেও দু'ফোঁটা জল টলমল করছে। দ্রুত পা বাড়ালাম। যতোদূর দেখা যায় মুখ ফেরাতেই দেখলাম তিনি হাসি মুখে হাত নাড়ছেন। আজও টুটু জীবিত। নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময় আজও আমাদের চলছে। তারপর কতোবার আমেরিকায় গেলাম, কিন্তু হাওয়াই আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি। কতো দেশে কতোঘর যে বেঁধেছি তার সীমা সংখ্যা নেই। এরা আমার অবকাশ যাপনের সঙ্গী, অমৃতময় স্বাদে আমার আজকের অবসর জীবন পূর্ণ করে রেখেছে।

বেশ আবেগ আপ্লুত ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ফিরলাম। পথে ভাবছিলাম আমার কাছে আমেরিকা ছিল ডলার অঙ্কিত মাপে হাসি ও কান্নার দেশ। না অন্তর অনুভূতি দেশ কালের কোনও ব্যবধান মানে না। যে ভালবাসতে জানে সে সব দেশে সবকালেই ভালবাসা বিলিয়ে যায়। টুটু তাঁর ছেলেকে নিয়ে স্বামীর ভিটা দেখতে গিয়েছিলেন, কিন্তু কিছুই পাননি। গ্রামের দু'চারজন বৃদ্ধ ছাড়া আর কেউ তাঁকে

চিনতে পারলেন না। শুধু এ্যালেক্স হাক্সলী নয়, 'রুটের' সন্ধান আজ সকল আমেরিকাবাসীরই।

সন্ধ্যায় হোটেলে ঢুকলাম। এ্যান লাউঞ্জে বসা। বিস্ময়ে বল্লাম, 'একি, তুমি সাঁতার কাটতে যাওনি ?' মাথা নাড়লো। ইঙ্গিতে হাতের বই দেখিয়ে বললো, 'এ আমাকে ধরে রয়েছে। তাছাড়া তোমার অনুমতি তো নিয়ে রাখিনি।' 'সে কি ? চলো এবারে।' এ্যান মাথা নাড়লো, 'না, না, তুমি ক্লান্ত, অন্য দিন হবে।' বল্লাম, 'না আমি যাব। তুমি ওঠ।' বল্লে, 'তোমার সুইমিং কস্টিউম ?' 'দরকার হবেনা।' রিসেপশনে আমার হাতের জিনিসগুলো নিয়ে এগুলাম। এ্যানের হাতে কাগজে মোড়া ওর সাঁতার পোশাক উঁকি দিচ্ছে ? খুব খারাপ লাগলো। এই মেয়েটা এক বুক আশা নিয়ে বসে আছে। মিনিট পাঁচেক হেঁটেই নীচে পেঁছান গেল। এবার আমি উপরের সিঁড়িতে ধপ করে বসে পড়লাম। বল্লাম, 'নামো তুমি ?' 'সেকি, তুমি সাঁতার কাটবে না ?' 'না আমি দর্শক, যাও দেরী করোনা। সময় 'সোনা' জানো তো ?' অপরাধীর মতো মুখ করে পোশাক বদলালো এ্যান। এতোটুকু সঙ্কোচ বা জড়তা নেই। অতো লোক সমাগমে কেউ তাকিয়েও দেখলো না। কে জানে নারীদেহের প্রতি এ দেশের পুরুষের কি মোহভঙ্গ হয়েছে ? হবেও বা। তবে মাংস-লোলুপতা তো কমেনি।

সমুদ্র এখন ফ্যাকাশে হলুদ। মিষ্টি আলো। প্রচুর নরনারী বালক বালিকা স্নান করছে। কেউ বা ছোট ডিঙ্গীটি কাঁধে করে বাড়িমুখো রওনা হয়েছে, কেউ বা বাচ্চাকে টেনে তুলতে ব্যস্ত। চারিদিকে বড় বড় গাছ। বেশীর ভাগেরই নাম জানিনা। আমি অরণ্য দেখতে ভালবাসি, তাই বৃক্ষ চিনতে চাইনি কখনও। বাতাসে ডালপালা আন্দোলিত। হাওয়াই চিরবসন্তের দেশ। আমার মনেও বোধ হয় দোলা লেগেছে। তাছাড়া সারা দিন রবীন্দ্র চর্চা করেছি। তারও একটা চাপ ছিল মন ও মস্তিষ্কের ওপর। সারা দিনের পরিতৃপ্ত ক্লান্তি—এদিক ওদিক অলস ভাবে তাকাচ্ছিলাম।

হঠাৎ চোখে পড়লো ওদেশী এক মহিলা প্রচণ্ড এক ঔৎসুক্য নিয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছেন। শাড়ী দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা নতুন কিছু নয়। তবে সেটাও এখন কমে এসেছে। পৃথিবীর সর্বত্রই এখন শাড়ী

অধ্যুষিত। ভারতীয়, বাঙালী, নেপালী, শ্রীলঙ্কাবাসিনী, মরিসাস-কন্যা, কেনিয়া বধূ অনেকেই শাড়ী পরেন। তবুও আবার তাকালাম মহিলার দিকে। কিছুটা দূরত্ব রেখে তিনি সিঁড়ির অন্যধারে বসলেন। ওর সোজা কোমর ছোঁয়া কালো চুল আমার চোখকে টানলো, কারণ চুলগুলো বড় বেশী কালো এবং ঘন, অন্তত ওই পরিবেশে ওদেশী মেয়েদের পক্ষে। গায়ের রঙটাও তুলনামূলকভাবে কিছুটা চাপা। অসুবিধা হ'ল ভালভাবে মহিলাকে জরিপ করতে পারছিলাম না। জাপানীতে 'বাও' করবার মতো যতোবার মাথা তুলছি ততোবার নামাতে হচ্ছে এবং ওপক্ষও একই কাজ করছেন। ভদ্রমহিলা উদ্ভিন্নযৌবনা ন'ন। বরং কন্দর্পের প্রসাদ অস্তাচল-মুখী বলেই মনে হ'ল। কড়া মেক আপ। পরনে হাওয়াই কায়দায় একই ছাপ ছাপ কাপড়ের ট্রাউজার ও হাওয়াইয়ান সার্ট। মাথায় একটা বড় ফুল গোঁজা। স্বাস্থ্য বয়সকে ধোকা দেবার মত অটুট। এবারে চোখ মেলে তাকালাম এবং হাসলামও। প্রত্যুত্তরের হাসিটা একটু মাত্রাতিরিক্ত বলে মনে হ'ল। ভাবলাম—একি? আমি তো পুরুষ না, তবে এ হাসির ডালির উপহার আমার জন্য কেন? হঠাৎ মনে হ'ল মুক্তার মতো দাঁতের সারি আর এ মিষ্টি হাসি আমি কোথায় যেন দেখেছি—হ্যাঁ নিঃসন্দেহে পরিচিত। ভাবলাম সদ্যসমাপ্ত মেক্সিকো আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনের কক্ষে, লাউঞ্জে, রেস্তোরাঁয়, পথে অথবা কূটনৈতিক মিশনের পার্টিতে দেখেছি নাকি? হবেও বা! কতো আন্দোলন করে এলাম সম-অধিকারের দাবিতে। অথচ ওই মেক্সিকোতেই এক পুরুষের চার পাঁচটা বউ। খেতেও দিতে হয় না, উপরন্ত খাটিয়েও নেওয়া যায়। এক দোকানদারকে দেখলাম তিন বউ নিয়ে কেনাবেচা করছে। প্রদীপের নীচেই অন্ধকার। এতো আপনার, আমার কথা নয়, ত্রিকালজ্ঞ-ঋষির আপ্ত বাক্য।

এতোক্ষণে শ্রান্ত ক্লান্ত এ্যান এসে পোশাক বদলাচ্ছে। চুল দিয়ে অঝোরে জল ঝরছে। ব'ল্লাম, 'মাথাটা মোছ, সর্দ্দি লাগবে।' খুশীতে ছোট, খুকীর মত হেসে উঠলো এ্যান, 'প্রফেসর আমি কি ছোট বেবী। ভিজে চুলে আমার খুব ভাল লাগছে। আমি দুঃখিত তোমাকে একা রেখে প্রায় এক ঘন্টা সাঁতরে এলাম। জানো এ জীবনে

আমি সম্ভবত আর হাওয়াই আসবো না। তোমার জন্যেই আমি এ স্বর্গসুখ পেলাম ; তোমাকে আমার চিরদিন মনে থাকবে প্রফেসর।'

সত্যিই এ্যানের হাওয়াই আসবার পথে অনেক অন্তরায় হয়েছিল। ওরা অর্থাৎ স্টেট ডিপার্টমেন্ট হাওয়াইতে এস্কর্ট দিতে রাজী হচ্ছিলো না। কিন্তু মেয়েটির উদগ্র আগ্রহ। ওর কপাল ভালো স্টেট্ ডিপার্টমেন্টের তখন বড়কর্তা ছিলেন আমাদের এক সময়কার পূর্ব পাকিস্তানের কন্সাল জেনারেল। পুরানো বন্ধু। তাঁকে বলতেই তিনি বল্লেন, 'নীলিমা নিজের জন্য কিছু চাও। একটা আমেরিকান মেয়ের জন্য আমাদের এতোগুলো ডলার গচ্চা দেওয়াবে কেন?' যাই হোক, তিনি তর্কে অথবা বন্ধুপ্রীতিতে পরাজিত হ'লেন, এ্যান এলো। কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ আমরা এয়ারপোর্টে এলাম ওর বয়ফ্রেণ্ডের গাড়িতে, ট্যাক্সীতে নয়।

ওর দিকে সস্নেহ দৃষ্টি দিয়ে বল্লাম, 'নিজের হাত পায়ে নিজে দাপাদাপি করেছো। এর জন্য আমাকে ঋণী করবার কোনও দরকার নেই।' হঠাৎ তাকিয়ে দেখি মহিলা আরও একটু কাছে সরে এসেছেন আর আমাদের বাক্যালাপ বেশ উপভোগ করছেন।

স্বভাবতই এ্যান তৃষ্ণার্ত। ওখানেই সৈকতে ছোট বড় অনেক রেস্তোরাঁ। একটা টেবিলে মুখোমুখী বসলাম দু'জনে। মহিলাও ধীরে ধীরে আমাদের অনুসরণ করে সামনের টেবিলে আমাদের দিকে মুখ করে বসলেন। চোখাচোখী হতেই আবার সেই বিজয়িনী মিষ্টিহাসি। এ্যানকে ব'ল্লাম, 'ওই মহিলা বীচ থেকে আমার দিকে চাইছেন, মনে হচ্ছে পরিচিত, ওকে ডাকবো আমাদের টেবিলে?' এ্যান বিস্মিত 'তুমি চেনো ওকে?' 'কে জানে, ঠিক বলতে পারবো না, হয়ত বা চিনি, হয়ত কোনও পরিচিতের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে।' এ্যান দার্শনিক গাম্ভীর্য নিয়ে বললো, 'নিশ্চিত না হ'লে ডাকবার দরকার নেই। দেখতে পাচ্ছোনা যেন একটা কস্মেটিক বক্স। ভাল জাতের মেয়ে মনে হচ্ছেনা। তাছাড়া ওকে ডাকলে ওর ড্রিংস-এর দাম তোমাকেই দিতে হবে।' মাথা নাড়লাম 'হ্যাঁ'-সূচক ভঙ্গীতে। এতো বড়লোক। কিন্তু আমেরিকাবাসীর মতো এতো হিসেবী জাত আমি পৃথিবীর কোথায়ও দেখিনি। খাবার আমন্ত্রণ এক টেবিলে, যে যার পয়সা দিচ্ছে। পয়সাই যদি দিলাম

তবে নেমন্তন্ন কিসের ?—না তোমাকে মূল্যবান সময় ও সঙ্গ দিচ্ছে। অবশ্য আমার দেশের মত দাওয়াত করেও অনেকে খাওয়ায়। তবে যার যার তার তার হ'লেই সবাই খুশী। যত্র তত্র পয়সা ভাগ হয়। সিনেমা থিয়েটারে গিয়ে বাদাম বা আলু ভাজা কিনেছি, এ্যান এসে পাই হিসাব করে দিয়ে গেছে। না নিলে অপমানিত বোধ করে। অবশ্য এটা সাধারণ রেওয়াজ, ব্যতিক্রমও কম নেই। এ্যান ঘন ঘন গেলাসে চুমুক দিচ্ছে। ইঙ্গিতটা বুঝতে পারলাম। আমি কেন জানিনা দু'জনকে লক্ষ্য করেই আনন্দ পাচ্ছিলাম, কারণ এতো স্বগোত্রীয়দের লড়াই। কিন্তু না, মুখ্য ভূভাগের লোক এদের একটু কৃপার চোখে দেখে। হায়রে বর্ণবৈষম্যবাদ আর জাতিসংঘ! তোমাদের বুকে জমাট অন্ধকার। তোমরা আবার অন্যের রোগ সারাতে চাও।

এই প্রথম এ্যান অভদ্রতা করলো, আমার অনুমতি না নিয়েই অর্থাৎ আমার গ্লাস খালি হয়েছে কিনা না দেখেই ও চেক দিতে ছুটলো। অন্যদিকের মহিলাও সম্ভবত ওকে লক্ষ্য করছিলেন তিনিও ধীরে সুস্থে উঠে ওর পেছনে গিয়ে কিউ দিলেন। আমি কেন জানিনা মহিলাকে ঠিক ঝেড়ে ফেলতে পারছিলাম না। আবার এ্যানের মতের বিরুদ্ধে যাবার মত মানসিক বলিষ্ঠতাও খুঁজে পাচ্ছিলাম না। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে আমি তার পবিত্র এক মূল্যবান আমানত। সুতরাং আমিও উঠলাম। এতোক্ষণে উপলব্ধি করলাম আমি যথেষ্ট ক্লান্ত, সারাদিন একটুও বিশ্রাম নেওয়া হয়নি। নীরবে এ্যানের সঙ্গে পথ হাঁটছি। আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে ওই মহিলা আমাদের অনুসরণ করছেন। এ্যান জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায়ও যাবো কিনা।' বল্লাম, 'সোজা হোটেল, বিশ্রাম প্রয়োজন।' তাছাড়া কাজের চাপে আজ ভোরে ডায়রী পর্যন্ত লেখা হয়নি। এ্যান দুঃখ প্রকাশ করলো। সে নিজের জন্যে আমাকে বীচে টেনে এনেছে ইত্যাদি। আমি ওর হাতে সস্নেহ চাপ দিতেই ও চুপ করে গেল। কেন জানিনা হঠাৎ মনে হ'ল ও বিস্ময়ের সঙ্গে আমাকে লক্ষ্য করছে।

হোটেলে ঢুকবার মুখে পেছনে ফিরে তাকাতেই দেখি মহিলা হোটেলের বিপরীত ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আছেন। এ্যানকে আর কিছু না বলে নিজের ঘরে চলে এলাম। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে

ইতস্তত করে বল্লাম, 'এ্যান খাবার জন্যে খুব তাড়াহুড়োর দরকার নেই। গোটা দশেকের সময় এসো।' এ্যান সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে একটু ম্লান হেসে চলে গেল। জানিনা কোনও কারণে মেয়েটাকে কষ্ট দিলাম কিনা। পর মুহূর্তে ভাবলাম, ঠিকই আছে ও আমার সফরসঙ্গিনী, চামড়া সাদা বলে জ্ঞানদায়িনী নয়।

সবে শাড়ীটা ছেড়ে একটু আরাম করে বিছানায় গা এলিয়েছি, দরজায় টোকা পড়লো। এ আমার পরিচিত এ্যানের অনুমতি চাওয়া নয়। মনে হ'ল আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় নিয়ে আমি যেনো এরকম একটা সঙ্কেতের অপেক্ষা করছিলাম। একটা প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে ছিলাম। দরজা খুলতেই, হ্যাঁ, সেই মহিলা। হেসে ব'ল্লাম, 'হাই।' মহিলা প্রত্যুত্তরে হেসে বল্লেন, 'আপনি কি ভারতীয়?' ব'ল্লাম, 'এককালে ছিলাম। এখন বাংলাদেশের অধিবাসী।' 'কলকাতার?' অধীর আগ্রহে জিজ্ঞেস করলেন মহিলা। 'না' সূচক ঘাড় নেড়ে ব্যাপারটা ওকে ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছিলাম। অধৈর্য মহিলা আবার প্রশ্ন করলেন, 'আপনি বাঙালী?' বিস্ময়ে আমার ওষ্ঠাধর কতোটা দ্বিধা-বিভক্ত হয়েছিল জানিনা, মাছি ঢোকেনি, শুধু এটুকু বলতে পারি। তবে এবারে সাদর অভ্যর্থনার সঙ্গে ব'ল্লাম, 'ভেতরে আসুন।' মহিলা সঙ্কোচে ঢুকে দাঁড়িয়ে রইলেন, 'বল্লাম দাঁড়িয়ে কেন, বসুন।' হঠাৎ কি হ'লো জানিনা, ভদ্রমহিলা আমাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে একটা ঝাঁকুনী দিয়ে বল্লেন, 'দিদি, আমি বালী, তুই আমাকে চিনিস নি। আমি তো তোকে দেখে ঠিকই চিনেছি।' 'বালী।' বিস্ময় বেদনায় আমার কণ্ঠরুদ্ধ হ'য়ে এলো। ওর মুখের দিকে তাকাতেই ও বাঁধভাঙ্গা বন্যার মতো ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো। ওকে ধরে চেয়ারে বসাতে চেষ্টা করলাম। ও আমার হাত ছাড়িয়ে মেঝের ওপর ভেঙ্গে পড়লো। আমি কার্পেটে ওর মাথাটা বুকে জড়িয়ে ধরে কিছুক্ষণ ওকে কাঁদতে দিলাম। তারপর টেনে চেয়ারে বসালাম। রুম সার্ভিসে কফির অর্ডার দিলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'কিছু খাবি?' বালী তখনও ফোঁপাচ্ছে। ঘাড় নাড়লো অর্থাৎ না।

মনটা চলে গেল অনেক দূরে, বহুদূরে ১৯৪১-৪৫ সালের ভারতবর্ষে। সারা পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধের ডামাডোল। ভারতে তার ঢেউ ভালভাবেই লেগেছিল। ক'লকাতার পথে বিচিত্র পোশাকধারী

সৈনিক, কর্মচারী, দেশী বিদেশী, কতো রকম যানবাহন। ১৯৪২-এ খিদিরপুরে আর ডালহৌসীতে বোমা পড়লো। কলকাতা নারী ও শিশুশূন্য হয়ে পড়লো। যাঁরা এতোকাল দেশ কোথায় জিজ্ঞেস করলে বলতেন, 'নারকেল ডাঙ্গা,' 'উত্তরপাড়া,' এখন তাঁদের মুখেই শোনা গেল, 'বানরীপাড়া,' 'মোরলগঞ্জ।' শিয়ালদা স্টেশনে ঢোকা যায় না। একটা বোঝার জন্যে কুলি হাঁকছে পঁচিশ টাকা। আমরা দু'বোন ডাণ্ডাস হোস্টেলে। বাবা লোক পাঠালেন, বোন চলে গেল। আমি গেলাম না। কারণ কলকাতায় মজা দেখবো।

চেয়েছিলাম মজা দেখতে, দেখলাম বিভীষিকা। এমন উলঙ্গ মৃত্যু জীবনে আর দেখিনি। ব্যবসায়ী ফুলে ফেঁপে লাল। নষ্ট চাউল নদীতে ফেলে দেওয়া হচ্ছে আর ভূমিহীন কৃষক শহরের লঙ্গর-খানায় এক বেলা খেয়ে অন্য বেলায় আহার্যস্পর্শের আগেই পৃথিবী ছেড়ে যাচ্ছে। চাউলের দাম আড়াই টাকা তিন টাকা থেকে একে-বারে দেড়শ'। লোকে কলার থোড়, কচু, নানারকম পাতা সেদ্ধ খেয়ে উদরপূর্তির পরিবর্তে শমনকে কাছে নিয়ে এলো। আঞ্জুমান আর হিন্দু সৎকার সমিতির গাড়ীর দ্রুত ধাবমান গতি সেদিনের কল-কাতাবাসীরা কখনও ভুলবে না। দ্বারিক, পুঁটিরাম, কে. সি. দাস থেকে শুরু করে ছোট বড় সব মিষ্টির দোকানে ও রেস্তোরাঁর সামনে ডাস্টবিনে মানুষ আর কুকুরের অবিরাম সংগ্রাম উচ্ছিষ্ট ভক্ষণের জন্য। আর দৈহিক এই ভাঙ্গনের সঙ্গে সঙ্গে ভেসে গেল সমাজকাঠামো। শিকেয় ওঠলো নীতিবোধ। অভাবে সব অনু-ভূতিই তুল্য মূল্য হয়ে যায়। আজ আমরা সমাজে যে অবক্ষয় দেখতে পাই মধ্যবিত্তের জীবনে, যেখানে নীতিবোধ সবচেয়ে সমাদৃত, সে-সমাজ নিম্নবিত্তে পরিণত হ'ল। আর এক-মুষ্টি অন্নের জন্য ফিরপো, গ্রেটইস্টার্ণ, গ্রাণ্ড, ব্রিস্টল থেকে শুরু করে ব্রডওয়ে পর্যন্ত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের গোপন অভি-সারের ঠাঁই হ'ল। এই মহাযুদ্ধের কাল থেকেই আমাদের জীবনের ধারাপাত বদলে গেল। মধ্যবিত্তের মেয়েদের রাজপথে পা দেওয়া সুরুই তখন থেকে। কতো মেয়ে সেনাবাহিনীতে নার্স এবং ওয়াকাই-এর চাকরি নিলো। কতোজনকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে পাঠানো হ'ল বিদেশী সৈনিকদের মনোরঞ্জনের জন্য। এই ডামাডালে একদিন এসপ্লানেডে

দেখেছিলাম বালীকে একটা সুন্দর লম্বা পোশাক পরা ঠোঁটে গালে প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রসাধন। কিন্তু সে মুহূর্তের এক ঝলক। তার-পর এই দেখা।

বিহার আর উড়িষ্যার সংযোগস্থলে শিংভূম জেলা। খনিজ সম্পদ আর বনজ ঐশ্বর্যে শিংভূম পরিপূর্ণ। ওখানকার একটা ছোট জনপদ। নাম তার বড়বিল। সেখানে আমার এক কাকার ব্যবসা ছিল---মাঙ্গানিজ, মাইকা ইত্যাদির। আমরা ভাইবোনেরা যারা কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম তারা ছুটি হলেই ওখানে যেতাম অবকাশ যাপনের জন্য। একেবারে আদিম বন্য পরিবেশ, বন্দুক হাতে সারাদিন ঘুরে বেড়ালেও কেউ কিছু বলেনা। ধাড়ী মেয়েদের সাইকেলে করে ঘুরতেও কোনও মানা নেই—সমালোচনার তো প্রশ্নই ওঠেনা। ফিরিঙ্গি সায়েবদের সঙ্গে শিকারে গেলে মান বাড়ে। ওদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খাওয়া আভিজাত্যের লক্ষণ। সুতরাং এ স্বর্গ রাজ্যের প্রতি আমাদের ছিল প্রচণ্ড আকর্ষণ। উপরন্তু কাকা চির-কুমার, সঙ্গীত শিল্পী, সাহিত্যরসিক, মজলিসী এবং অর্থ বিষয়ে অকৃপণ। সব রকম অহেতুক প্রশ্রয়, অফুরন্ত খাদ্যবস্তু। বাড়িতে পালা মুরগী। যতো ইচ্ছা খাও, কলকাতায় যা ভাবতেও পারতাম না। আমাদের মেয়েদের কাজকর্মের জন্য একজন বয়স্কা কোলরমণী রাখা হয়েছিল। আমরা থাকি আর না থাকি তার চাকুরী বারো মাসের। দৈনিক মাইনে পাঁচ আনা যা আমাদের সব কুলীরাই পেতো। অবশ্য আমরা থাকলে তার খাওয়াটা ছিল উপরি। মহিলা অন্য কোল রমণীদের থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র। তার পেটা শরীর, ন'হাতি একখানা লাল পাড় ফর্সা সাদা শাড়ী আট গাঁট করে পরা। তখন কোন মেয়েরা শাড়ী পরতো না এবং শুধু অধঃ অঙ্গ আবৃত করতো। কোমর থেকে গলা পর্যন্ত আবরণহীন; নানা রকম মালা পরতো যুবতী মেয়েরা, হয়ত বা আমাদের তত্ত্বাবধান করবে বলেই আমার কাকা এই সংযত চরিত্রের মহিলাকে নিয়োগ করে-ছিলেন।

আজ থেকে কতো বছর আগে। সময়ের ধূসর যবনিকা ভেদ করে বড়বিল আমার চোখের সামনে সদ্য জাগা দ্বীপের মত ভেসে উঠলো। আমরা যখন যেতাম কিশোরী বালী ওর মায়ের হাত ধরে

আমাদের বাড়ীতে আসতো। ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলা বলতো আর কোনও কাজের ফরমাস দিলে খুসীতে বাগ বাগ হয়ে উঠতো। তখনই ও গভীর মনোযোগের সঙ্গে আমাদের লক্ষ্য করতো। আস্তে আস্তে আমাদের পুরানো ফ্রক ছেড়ে ও শাড়ী ধরলো। ওর মা ওকে পেটিকোট পরাতো, খালি গায়ে থাকতে দিতো না। মহিলা খুব বেশী পুরুষ সচেতন ছিলেন। অর্থাৎ পুরুষের সঙ্গ সযত্নে এড়িয়ে চলতেন। আর মেয়ের ওপরও কঠিন কঠোর দৃষ্টি রাখতেন।

বড়বিলকে তখন মনে হতো মহাসমুদ্রের বুকে ছোট্ট একটি শান্তিদ্বীপ। ওখানকার আদিম অধিবাসী কোল। বার্ড কোম্পানির বিরাট বিরাট কারখানায় ইংরেজ আর ফিরিঙ্গি সাহেবদের দাপট। আজও মনে পড়ে জনাব সিরাজউদ্দীন নামেও একজন বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁর বাগানের ন্যাংড়া আম ছিল আমাদের মস্ত বড় আকর্ষণ। দেশ বিভাগের পর স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় দেখেছিলাম কি একটা মামলায় তিনি জড়িত হন। মিত্র এ্যাণ্ড মিত্র ছিল। আজ চল্লিশ বছর পর কারও কথাই বিশেষ আর মনে পড়ে না। এঁরা সবাই বনজ আর খনিজ সম্পদের মালিক ছিলেন। আর ছিল অগণিত কুলী কামিন ; তাদের খবরদারী করবার জন্য ছিল উড়িয়া আর বাঙালী ঠিকাদাররা। একজন বাঙালী ডাক্তার ছিলেন। সবাই তাঁকে খুব সমীহ করতো। তিনি ছিলেন সাহিত্যরসিক। ওঁর ওখানে মাঝে মাঝে সাহিত্যসভা বসতো। অনেকেই এখান ওখান-কার লেখা নিজের বলে চালিয়ে দিয়ে বাহবা পেতেন। কিন্তু তবুও ওখানে অনাস্বাদিত আনন্দ পেতেন গুটিকয় লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, মাইকা আর বনজ দপ্তরের কর্মচারীরা। অবশ্য পাঁচজন বাঙালী যেখানে সেখানে সাহিত্য মজলিস আর আড্‌ডাখানা থাকাই তো স্বাভাবিক।

আমাদের বাড়িটা ছিল কাঠের বাংলো। চারিদিকে মোটামোটা শাল আর কড়ুই গাছের গুঁড়ির দেওয়াল। এ ধরনের দেওয়ালের তাৎপর্য পরে বুঝেছিলাম। ওটা সৌন্দর্যের কারণে নয়, প্রাণ বাঁচা-নোর তাগিদে। অবশ্য ওর ওপর নানাধরনের লতানো গাছ ছিল। তার ভেতর ছোট ছোট লাল ফুলওয়ালা রঙ্গনলতা এখনও চোখের সামনে ভাসে। সামনে প্রশস্ত লন আর পেছনে ধান, মকাই আর ভুট্টার ক্ষেত।

পথের বিপরীত দিকে থাকতেন বার্ড কোম্পানির ম্যানেজার ক্যাম্পবেল সাহেব। জাতে পাকা ইংরেজ, কিন্তু ওদেশে কতো বছর আছেন আমার কাকাও বলতে পারেন না। আমি যখনকার কথা বলছি তখন বয়স পঞ্চাশ পার হয়ে গেছে। অপূর্ব রূপবান শুধু নয়, তিনি ছিলেন একান্তভাবে রূপসচেতন ব্যক্তি। আমার এ দীর্ঘ জীবনে এমন সুপুরুষ ইংরেজ আমি দেখিনি। অবশ্য তখন আমার বয়স ছিল তাতে চোখে যথেষ্ট ঘোর, থাকবার কথা। ক্যাম্পবেল সাহেব ছিলেন অকৃতদার। তবে তাঁকে রমণীমন আখ্যা দেওয়া যেতো।

কয়েক বিঘা জমির ওপর ছিল তাঁর বিশাল বাংলো। লনের চারিদিকে নানা জাতীয় ফুলের কেয়ারী। দু'পাশে দু'টো ইঁদারা। কপিকলের সাহায্যে সারাদিন ওখান থেকে পানি তুলতো জনা দশেক কোলরমণী। এক কোণে আম গাছে বড় একটা দোলনায় ওই মেয়েগুলো যখন তখন দোল খেতো আর হেসে এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়তো। সাহেবকে অবশ্য দিনের আলোয় কখনও দোল খেতে দেখিনি। মেয়েগুলোর বয়স পনেরো থেকে পঁচিশের ভেতর—ক্যাম্পবেল সাহেবের বাগানেই শুধু পানি সেচন করতো না ওরা, সাহেবের নর্মসহচরীও ছিল।

আমাদের ও দেশীয় কর্মচারী 'নট' প্রায়ই আমাদের সাবধান ক'রে দিত, 'দিদিমণি ওদের সঙ্গে কথা বলোনা। ওরা সব নষ্ট মেয়ে মানুষ।' এখন ভাবি ওরা তো নষ্ট ছিল, কিন্তু ওই রাজপুত্রটি রাজার জাত ব'লে কতো খ্যাতি ও সম্মানই না পেতো ওই ছোট জায়গাটিতে। সকাল বিকেল মুখোমুখী দেখা হ'লে টুপী খুলে আমাদের শুভেচ্ছা জানাতেন। তাঁর আতিথ্য-যে আমাদের জন্য সব সময়েই উষ্ণতা নিয়ে অপেক্ষা করছে সে-কথা জানাতে ভুলতেন না। কিন্তু আমাদের গৃহস্বামীর কঠোর নির্দেশ ছিল আমরা যেন কখনও রাস্তা পার হয়ে ওই গেটে না ঢুকি। তিনি অবশ্য বন্ধুর মতো সাহেবের সঙ্গে সহাস্য আলাপচারিতা করতেন।

মেয়েগুলো সকাল থেকেই সেজেগুঁজে তাদের পুরুষ্ট দেহে সাদা খাটো কাপড় জড়িয়ে অনাবৃত বুকে ফুলেরমালা ঝুলিয়ে ইদাঁরা থেকে জল তুলতো আর গাছে দিত। ওদের হাসির শব্দ

আমাদের ঘর পর্যন্ত আসতো—মনে হ'তো এক একটি পূর্ণ সুখের প্রতীক—স্বর্গের পরী। সুখ ছাড়া এদের জীবনে আর কিছু নেই। অবশ্য ও এলাকার আদিবাসীদের ভেতর দু'বেলা খেতে পাওয়া একটা ভাগ্যের কথা। বড় দরিদ্র আর দুঃখী ছিল ওরা, ভীরুও কম নয়।

মাঝে মাঝে আমাকে সপ্তাহান্তে ওদের মজুরী দিতে বসতে হতো। মেয়েরা এসে কান্নাকাটি করতো পুরুষদের যেন সব টাকা না দেওয়া হয়। ওরা একদিনে নেশা করে সপ্তাহের রুজি শেষ করে ফেলবে। মাঝে মাঝে ওদের কান্নায় বিচলিত হয়ে মেয়েদের হাতে টাকা দিয়েছি। কাকার কাছে বকুনীও খেয়েছি। তাঁর কথা যার যার উপার্জন তার হাতে দিয়ে দেবে। টাকা দিয়ে তারা কি করবে না করবে সেটা দেখার দায়িত্ব আমাদের নয়। সত্যিই তো মালিক পরিবার শ্রম কিনবে—শ্রমের পথে শ্রমিক জাহান্নামে গেলে মালিকের কোনও দায়-দায়িত্ব নেই।

এই বালী ওই বড়বিলের মেয়ে। আগেই বলেছি, বালীর মা ছিল একটু ব্যতিক্রমধর্মী। অত্যন্ত গম্ভীর ও বাক্‌সংযত। বিরাট জালার মতো কলসী মাথায় করে ঝরনা থেকে আমাদের খাবার জল আনতো। আসা যাওয়ার পথে রক্তচক্ষু করে ক্যাম্ববেলের পরীদের ভস্মীভূত করতে চেষ্টা করতো। অথচ বালী আমাকে যখন তখন বলতো, 'দিদি আমি বড় হয়ে ক্যাম্ববেলের বাড়িতে চাকরি নেবো।' বলতাম, 'চুপ কর। তোর মা শুনতে পেলে তোকে কেটে নদীতে ভাসিয়ে দেবে।' বালী কিন্তু ভয় পেতো না, 'বলতো লায়েক হ'লে মা আবার কি ? আমি যা চাইবো তাই হবে।' মাঝে মধ্যে আমাদের গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে মায়ের অলক্ষ্যে ও রাজপুত্রের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে হাসি বিলিয়ে দিতো। মনে হয় ওই চৌদ্দ পনেরো বছর বয়সেই সে তার বন্য পরিবেশের বাইরে একটা পরিচ্ছন্ন বিলাসী জীবন কামনা করতো। হয়ত বা কয়েক বছরের আমাদের আসা যাওয়া ওর ভেতর একটা উচ্চাশার বীজ বপন করেছিল। আমাদের নিত্যদিন ওকে প্রলুব্ধ করেছিল। পরিবেশ মানুষকে-নতুন করে গড়ে ; মুহূর্তে তার জীবনের রঙ্ বদলায়। বড়বিলের বন্য পরিবেশে আমরাও উদ্দাম হয়ে উঠতাম। বাবা, মা উপস্থিত

না থাকার মানে আরো কিছু করতাম যা কলকাতার চৌহদ্দীতে সম্ভবপর ছিল না।

বাইসন শিকারে যাবেন ইঞ্জিনিয়ার ফ্রিম্যান। আমার কাকার শিকারের সখ ছিল। শিকারটা তাঁর জঙ্গলেই হবে। বেশ গোটা কয়েক নানা আকারের ও শক্তির বন্দুক নেওয়া হ'ল। এক ট্রাকে কুলী। বড় বড় সার্চ লাইট, বিরাট আয়োজন। দু'বোনে বায়না ধরলাম আমরাও যাবো। অনেক তর্জন গর্জনের পর অভিভাবক নীরব রইলেন, কারণ আমন্ত্রণ যোগাড় করা হ'ল স্বয়ং ফ্রিম্যান সাহেবের কাছ থেকে। বালী আমার আচঁলের খুঁট ধরে বইলো। অতএব ট্রাকের সামনের আসনে সেও একটু জায়গা পেলো। আমরা পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে উঠলাম। এ পথে অবশ্য আমরা অনেকবার এসেছি. এখানে পাহাড়ের উপরেই প্রথম দেখেছিলাম ময়ূর নাচের জায়গা। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। গাছে গাছে ময়ূরের কর্কশরব আর নীচে বৃত্তাকার একটি জায়গা। সুনিপুণভাবে কে যেন ধূলোর কণাগুলিকে পর্যন্ত গুঁড়িয়ে বিছিয়ে দিয়েছে। ময়ূরেরা নিজেরাই এ নৃত্যাঙ্গন প্রস্তুত করেছে। মেঘ ডাকের অপেক্ষা, তারপর শুরু হবে নাচ। নাচ দেখা আমার ভাগ্যে কখনও হয়নি তবে ড্রাইভার তারাচাঁদ বাবুর কাছে বর্ণনা শুনেছি, তিনি দেখেছেন। তাঁরাচাদ বাবু পাঞ্জাবী হিন্দু, বড় অমায়িক আর স্নেহপ্রবণ। আমাদের মেয়ের মতো দেখতেন আর বলতেন খুকী, তোমাদের আমি যেসব জায়গায় নিয়ে যাই কোনও ইংরেজ মেমসাহেবও সেসব জায়গায় কখনও যায়নি। কথাটা মিথ্যা নয়। আমরা গেলে ওঁর একঘেয়ে জীবনে একটু প্রাণের সঞ্চার হতো।

প্রচণ্ড শব্দ করে যন্ত্রদানব ওপরে উঠে নিঃশব্দ হয়ে গেল। চারিদিকে পিচ্‌কালো অন্ধকার। কৃষ্ণপক্ষ। তার ওপর ঘন বন। গাড়ীর লাইট বন্ধ। দু'দিকের জানালা দরজার কাঁচ তোলা, কারণ যে কোনও সময় বন্য পশুর আক্রমণ হতে পারে। শিকারীরা কিছু কুলীসহ জঙ্গলের ভেতর চলে গেলেন। দূরে একটা জলাশয় মতো জায়গা। ঝরনার জল নীচে নেমে জমে আছে ছোট একটা ডোবার আকার নিয়ে। ওখানে বাইসনরা জল খেতে আসবে— শিকারীদের এই প্রত্যাশা। হঠাৎ অন্ধকারের বুক চিরে আলোর রেখা

এবং রাইফেলের মুহুর্মুহু আওয়াজ এলো। একেবারে পঁচিশ ত্রিশটা বাইসন জঙ্গলের অন্যদিকে চলে গেল। বুকের ভেতর ঢেকির পাড়, জিভ তালু শুকিয়ে কাঠ। তারাচাঁদ বাবু জানালার কাঁচ নামালো। দু'টো কুলী দৌড়ে এসে অন্য কুলীদের ডেকে নিয়ে গেল। দুটো বাইসন পড়েছে। শিকারীরা কিছুক্ষণ বাদে ফিরে এলো। কুলীরা দড়ি দিয়ে বাইসন দুটোকে বেঁধে ট্রাকে তুললো। এমন সময় বৃষ্টি নামলো। সবার মুখ শুকিয়ে গেছে। আকাশে তাহলে শুধু চাঁদেরই অভাব ছিলনা, মেঘেরও প্রাচুর্য ছিল। ও অঞ্চলের বৃষ্টি বড় ভয়ানক। সামান্য বর্ষণেই নদী নালা দুরন্ত গতি পায়। সকালে হেঁটে পার হওয়া নদী এক পশলা বৃষ্টির পর হাতি ভাসিয়ে নেয়। সব কুলীদের গাড়ী থেকে নামানো হ'ল। ওরা শুকনো পাতা জড়ো করে গাড়ীর চাকার সামনে দিতে লাগলো আর ওই যন্ত্রদানব আমাদের মতো ভয়কাতর মানুষ নিয়ে আস্তে আস্তে নীচে নামতে লাগলো। সমতল ভূমিতে নেমে তারাচাঁদ বাবু রুমাল বের করে কপাল, ঘাড় মুছলেন। এতোক্ষণে বিপদের গুরুত্ব উপলব্ধি করলাম। কাকা চাপা গর্জনে আমাদের ধমকাচ্ছেন। বালী আমার বুকের কাছে গুঁজে বসে দুলছে।

ফিরে এসে বাড়ীর সামনের সীমানায় এক মহোৎসব বসলো। ফ্রিম্যান চলে গেলেন শুভরাত্রি জানিয়ে। একটা চামড়া সকালে ওঁর ওখানে যাবে একটা আমাদের থাকবে। বিরাট অগ্নিকুণ্ড জ্বালা হ'ল। সারারাত খোল মাদলের আওয়াজ আর প্রচণ্ড চিৎকার কানে এলো। কাছাকাছি এলাকার সব নারী পুরুষ জমা হয়ে ওই ঝলসানো বাইসন আর হাড়িয়া নিয়ে মহোৎসবে বসে গেল। সকালে দেখলাম বালী নেই। মহুয়া খেয়ে বেহুঁস হবার জন্য ওর মা মারতে মারতে বাড়ি নিয়ে গেছে। আমরা লজ্জা পেলাম। ভাবলাম বালীর মায়ের বাড়াবাড়ি। এটা তো ওদের সমাজে কোনও অন্যায় নয়। এমন আমোদ-প্রমোদ তো ওরা সুযোগ পেলে করেই থাকে। বালীর বাপকে কখনও আমরা দেখিনি, বালীও দেখেনি। আজ বুঝি এটাই ছিল বালীর মায়ের অতি সতর্কতার কারণ।

ওই আনন্দে ভরপুর জায়গাটি আজও আমার মনে ফ্রেমে বাঁধা একখানা ছবির মতো আটকে আছে। আজ প্রায় ত্রিশ বছর পার করে

বালীকে দেখে ওই সুপ্ত স্মৃতি জেগে উঠলো। সম্বিত ফিরে পেয়ে আস্তে করে বল্লাম, 'বালী এখানে এলি কি করে?' বালী কথা বলছিল বিশুদ্ধ আমেরিকান একসেন্টে। বল্লাম, 'বাংলাতেই কথা বল।' ও বললো, 'দিদি এখুন ভাল বলতে পারবো না। কতো দিন অভ্যাস নেই। তবুও বলবো। যতোক্ষণ তোর কাছে আছি। আমার কথা বলতে গেলে সাত দিন লাগবে।' 'লাগুক, তুই বল'। 'তুমি ক'দিন আছ?' অসীম আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞাসা করলো বালী। 'আরও দিন তিনেক আছি', জবাব দিলাম। 'তাহলে কাল দুপুরে আমার বাড়িতে খাবে। সেই সঙ্গে আমার সব কথা তোমাকে শোনাবো।' 'বল্লাম 'কাল দুপুরে তো হবে না। ইস্ট ওয়েস্ট সেন্টারের বড় কর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার ও দুপুরে খাবার কথা। পরশু দিন তোর ওখানে যাবো।' ঔৎসুক্য নিয়ে বালী জিজ্ঞেস করলো, 'কাল হোটেলে ফিরবে কখন?' মনে মনে সময়ের হিসাব করে ব'ল্লাম, 'আশা করি তিনটের ভেতর ফিরবো। তার পর আর কোনও কাজ নেই।' বালী উঠে দাঁড়ালো। 'আমি কাল পাঁচটায় আসবো তুমি তৈরি থেকো।'

দরজায় টোকা পড়লো, এ এ্যানের সংকেত। আমার পরিচিত। ব'ল্লাম, 'ভেতরে এসো।' ঢুকেই এ্যান থমকে দাঁড়ালো, ভ্রু ঈষৎ কুঞ্চিত। তার অজ্ঞাতেই দুটো হাত যুদ্ধং দেহি ভাবে কোমরে উঠে এসেছে। এবারে বালী ওকে গ্রাহ্য করলো না। বললো, 'দিদি, মা কেমন আছে জানিস?' মাথাটা ওর অনেক খানি নীচু হয়ে এসেছে। ওর সঙ্গে আরেকটু ঘনিষ্ঠ হয়ে ওর পিঠে হাত রেখে ব'ল্লাম, 'সেই পঁয়তাল্লিশ সালের পর আর বড়বিলে যাইনি। আমাদের ওখানকার পাট চুকে গেছে। কাকা এখন রাণীগঞ্জে কয়লায় বেশী পয়সার সন্ধান পেয়েছেন। পাকিস্তান হবার পরও বেশ কয়েক বছর ফ্রিম্যান সাহেবের সঙ্গে চিঠির আদান প্রদান ছিল, কিন্তু তাতে তো তোর মায়ের খবর নেই। তুই ঠিকানা দিলে আমি চেষ্টা করতে পারি।' 'বুঝলাম বালীর নীরবতা ওর নিজেকে সামলানোর চেষ্টা। একটা বিদেশী মেয়ের সামনে নিজেকে ভাঙ্গতে চায় না। 'মার কোনও ঠিকানা নেই' বোধ হয় মরে গেছে। 'আচ্ছা কাল তোর সঙ্গে দেখা হবে।' আমি বল্লাম, 'বালী আমার সঙ্গিনী

এ্যান, এ্যান, আমার অনেক কালের বন্ধু, বালী।' দায়সারা হাত মেলালো দু'জন। বুঝলাম কেউ কাউকে পছন্দ করলো না। কথা না বাড়িয়ে দরজা ঠেলে বালী বেরিয়ে গেল।

স্তম্ভিত এ্যানের চোখে মুখে ঔৎসুক্য যেন ফেটে পড়ছে। 'প্রফেসর, তোমরা কি ভাষায় কথা বলছিলে, মহিলা কে? বিকেলে তো নীচে তুমি বললে ওকে চেনো না?' হেসে ব'ল্লাম, 'ধীরে এ্যান ধীরে। প্রথম প্রশ্নের উত্তর, ভাষাটার নাম বাংলা। একটা ভারতীয় ভাষা, বর্তমানে আমাদের বাংলাদেশের ভাষা। দ্বিতীয়ত মহিলা ভারতীয়। এদেশে এসেছেন ত্রিশ বছর আগে, এখানকার নাগরিক। আর তোমার সব শেষ প্রশ্নের উত্তর, ও আমার ছোটবেলার বন্ধু। এখানে এ পরিবেশে ওকে আমি ঠিক চিনতে পারিনি, কিন্তু ও আমাকে ঠিক চিনেছে।' 'তাহলে বিকেলে বললো না কেন?' ব'ল্লাম, 'আমার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছিল। তাছাড়া না চিনবার জন্য তারও তো অভিমান হতে পারে। নাও চলো, দেখি আজ তুমি কি খাওয়াও।' দরজাটা বোধ হয় একটু জোরেই বন্ধ হ'ল। মনে হ'ল এ্যানের সামনে আমি বালীর প্রসঙ্গটা চাপা দিলাম। বুদ্ধিমতী এ্যান গোপনীয়-তার আভাস পেলো। চুপ করে গেল।

দু'জনে হাঁটছি চুপ চাপ। এ্যান হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা টেগোরের ভাষা বাংলা না?' 'নিশ্চয়ই, তবে আমাদের কথোপকথনের ভাষাটা মৌখিক অর্থাৎ কথ্য।' জবাব দিলাম ঈষৎ হেসে। এ্যান বললো 'না, না, বুঝেছি সেটা।' ও রকম কথ্য আর সাহিত্যের ভাষার ফারাক তো পৃথিবীর সর্বত্রই আছে।' দু'জনে নিঃশব্দে হাঁটছি। রাত প্রায় দশটা কিন্তু আলো ঝলমল রাস্তা আর বিপনী শ্রেণী সান্ধ্য-বিহারের কথা জানিয়ে দিচ্ছে। এ্যান তাকিয়ে তাকিয়ে রেস্তোরাঁ বা কফিশপ পছন্দ করছিল। এক জায়গায় ও দু'দিন খেতে চায় না। অথচ আমার স্বভাব একবার এক জায়গায় ঢুকলে আর স্থান পরি-বর্তন না করা। কফিশপগুলো জমজমাট, ট্যুরিস্ট ভর্তি। কতো দূর-দূরান্ত থেকে এই হাওয়াই দ্বীপে লোকে বেড়াতে আসে। তাছাড়া এখানকার অধিবাসী চীনা, জাপানী, কোরিয়ান, মালয়েশীয়ান ইত্যাদি। আমি যখন গিয়েছিলাম তখন গভর্নর ছিলেন জাপানী। মনে হয় ব্যাঙ্ককের মতো এখানকার রেস্তোরাঁগুলোও সারারাত খোলা থাকে পর্যটকদের জন্য। প্রায় সব ট্যুরিষ্ট স্পটেই এমনটা চোখে পড়ে, কারণ

এসব জায়গায় লোকে তো শুধু নিসর্গকে উপভোগ করতেই আসেনা। সঙ্গে নিয়ে আসে একটা ভাবমুক্ত মন যা তাকে তার দৈনন্দিন কর্ম-সূচী দায়িত্ববোধ আর পরিচিতগণ্ডীর চার দেয়াল থেকে মুক্ত রাখে। সম্ভবত তাই এই ঢিলেঢালা ভাব আর নিয়ম ঔদাসীন্য।

হঠাৎ এ্যান নীরবতা ভাঙ্গলো।' প্রফেসর, তোমার কি হয়েছে? তুমি তো হাঁটো আর আমাকে প্রশ্ন করো। আমি কি কোনও কারণে তোমার সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করেছি?' 'না, না এ্যান তুমি খুব ভাল মেয়ে, তুমি কি করে অভদ্র হবে? আমি রাতের হাওয়াই উপভোগ করছি। 'সত্যিই', এ্যানের কণ্ঠস্বর দায়মুক্ত তারল্য পেলো। 'তাহলে চলো বীচ্ হোটেলে যাই।' 'না এ্যান খুব বেশী হাঁটতে ইচ্ছে করছে না।' এ্যানকে বলতে ইচ্ছে করছিল ঃ এ্যান মনটা আমার আজ বড় ভারাক্রান্ত। কোন এক অশুভ অদৃশ্য শক্তি আমাকে আর বালীকে একই সময় ঘর ছাড়া করেছিল। আত্মীয় পরিজন বাবা মা যাঁদের বুকের উষ্ণতায় বেড়ে উঠেছিলাম তাদের ফেলে চলে গিয়েছিলাম অনেক দূরে। আমি আবার সব ফিরে পেয়েছি। কিন্তু বালী আজ এই উপল উপকূলে বন্দিনী। কেন এই নির্জন দ্বীপে ওর নির্বাসন! স্রোতের শেওলা ঝর্ণার নুড়ী অনেক দূরে ভেসে বা গড়িয়ে আসে, কিন্তু সেই ভারতমহাসাগরের কন্যা আজ প্রশান্ত মহাসাগরে এলো কোন নিয়তির নিষ্ঠুর আহবানে। তবে কি এ জন্ম-জন্মান্তরের গ্রথিত সূত্র! বালী তো এতোসব জন্মান্তরবাদ জানে না। তবে ও নিজের কাছে এর কি ব্যাখ্যা দেয়। একটা শাশ্বত সান্তনা সর্বকালে সকল দেশে চরিত্রহীন নারীকে শাস্তিদানের বিধান আছে। সন্তান ধারণের শক্তি তাদের পাপের বজ্রসম পরিমাপ যন্ত্র।

ছোট বেলায় নলিনী সরকারের একটা গান শুনলাম গ্রামোফোন রেকর্ডে—

'তোমরা শহর ঘুরিয়া বেড়াও রাত্রে
সেটা যেনো কিছু নয়,
মোরা কাহারও সহিত কহিলে কথা
তোমাদের নাহি সয়।'

বিপ্লবী ইরানে ধর্মীয় অনুশাসন অনুযায়ী দুশ্চরিত্রা রমণীকে পাথর ছুঁড়ে মারা হচ্ছে। ভাবি নারী তো একা দুশ্চরিত্রা হতে পারে

না। তাকে এ ছাপ দিতে হলে একাধিক পুরুষের প্রয়োজন। তা হ'লে এইসব স্বধর্মীয় সহযোগী পুরুষেরাই কি পাথর ছুড়বার দায়িত্বটা নিয়েছেন? ওদেশের মেয়েদের মনে কি এসব প্রশ্ন জাগে না। নিশ্চয়ই জাগে কিন্তু আজও ইবসেনের নোরারা অন্তঃপুরের অন্ধকার বাড়ীতে পুতুলের ভূমিকা নিয়েই আছে। কবে কোন পথে তাদের মুক্তি আসবে অথবা আদৌ আসবে কিনা জানি না।

কখন এসে রেস্তোরাঁয় বসেছি, এ্যান আমার হাতে মেনুচার্ট ধরিয়ে দিয়েছে খেয়াল নেই। ওয়েট্রেস্-এর সুরেলা কণ্ঠে চমক ভাঙ্গলো। এ্যানকে বল্লাম, 'আম আর আনারস ছাড়া তুমি আর কি খাবে?' এ্যান হেসে বললো, 'না আমি আম আর আনারস খাওয়া ছেড়ে দেবো। তুমি আমাকে এ নিয়ে অনেক দিন ক্ষেপিয়েছো।' খাবার অর্ডার দিলাম নিরুৎসাহের সঙ্গে। কেন জানিনা এতো শ্রম সত্ত্বেও রুচি আমার হারিয়ে গেছে। এ্যান হাওয়াই আসবার আগে থেকেই সুর ধরেছিল, হাওয়াই গেলে আম খাবো। যে দিন এসেছি সেদিন রাতেই ও বাইরে থেকে একটা বড় আম কিনে এনেছিল। আমাকে সেধেছিল ও। কিন্তু আমেরিকার আমের বুনো গন্ধ এখনও আমার নাকে লেগে আছে। আমার ন্যাংড়া, দশেরি, গোপালভোগ, বেগমফুলী জিভ্ সে তো আর এ্যান জানে না।

আমার চোখে তখনও বড়বিলের অঞ্জন। যুদ্ধের ছোঁয়া বড়বিলেও লেগেছিল। বাড়ির কাছে রেল লাইন। সারারাত যার যার মালগাড়ীতে লোহা ম্যাঙ্গানিজ আর কাঠ বোঝাই হতো। বড় বড় হ্যাজাক বাতি আর কুলীদের হৈ হল্লায় চোখ বোজা দায় হতো। অবশ্য সব দিন নয় যেদিন আমাদের কোম্পানির ওয়াগন বোঝাই হতো। ডিসেম্বরের শীতে যখন পাশ ফিরতে পারতাম না তখনও দেখতাম কুলীরা খালি গায়ে ঘাম ঝরাতো। এসব জিনিস যুদ্ধের প্রয়োজনে লাগবে। তাই এ প্রচণ্ডশীতে অমানিশার রাতে সুদূর গণ্ড গ্রামে অন্ধকারের বুক চিরে আলোর ঝলকানী।

এই যুদ্ধের ডামাডোলে তবুও বড়বিল ছিল পরম শান্তির জায়গা। অন্ততঃ দিবারাত্রি 'মা গো ভাত দাও, মাগো ফেন দাও' শুনতে হ'তো না। বালী হঠাৎ একদিন এসে বললো, 'দিদি, মেমসায়েবের বাড়ি যাবি? চলনা উই তো পথের ওধারে খুব কাছে। আমি

তোদের কথা অনেক বলেছি। তোরা গেলে খুব খুশী হবে।' দু'বোনে চল্লাম মেমসায়েব দেখতে। মা বলতেন, 'নেই কাজ তো খই ভাজ।' সত্যিই হাতে কোনও কাজ নেই। সায়েবদের বাড়ী অভিভাবক ছাড়া যেতে মানা। কিন্তু মেমসায়েবের বাড়ি যেতে তো নিষেধ নেই। গিয়ে দেখলাম গাউন পরা এক কোল রমণী। তিনি খ্রীস্ট ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে মেমসায়েব হয়েছেন। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, ঈষৎ খর্বকায়া। বয়স চল্লিশের কাছে। তবে সুঠাম দেহের অধিকারিণী। ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজী বলেন। ওই অঞ্চলে বহু মিশনারী দেখেছি। উপজাতিদের অঞ্চল এঁদের জন্য পীঠস্থান, কারণ আমাদের সমাজে, বিশেষ করে হিন্দু উচ্চবর্ণের সমাজে এরা অপাংক্তেয়। সুতরাং কেউ যদি তাদের আহারে. বিহারে শিক্ষা-দীক্ষায় ও জীবন যাপনে সমঅধিকারের আশ্বাস দেয় তাহ'লে কেন তারা সেদিকে ঝুঁকবে না ? ভারতে মাদ্রাজে প্রচুর খ্রীস্টান, কারণ মাদ্রাজে অস্পৃশ্যতা আজও হাস্যকর ভাবে বিদ্যমান। কোল, সাঁওতাল ইত্যাদি সমাজে এই মিশনারীরাই আশা ভরসা। আমাদের উপজাতীয় অঞ্চলে একই অবস্থা।

আমরা মেমসায়েবের ঘরে ঢুকলাম যথেষ্ট সঙ্কোচের সঙ্গে। চারি দিকে বাঁশের বেড়া এবং মাটির মেঝে, কিন্তু কি সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন. ঝকঝকে তকতকে। আমার মায়ের ভাষায় সিদুঁর পড়লে তুলে নেওয়া যায়। সামনে কাঠের তক্তা জোড়া দেওয়া টেবিল আর তার দু'দিকে লম্বা করে বাঁশ কয়েক সারি এক সঙ্গে বেঁধে বেঞ্চ তৈরি করে চেয়ারের অভাব দূর করা হয়েছে। টেবিলের ওপর একটা ছাপ ছাপ সস্তা ঢাকনা তার ওপর মাটির ছোট ভাঁড়ে সুন্দর করে পাতা মিশিয়ে ফুল সাজানো। অথচ ওই ভাঁড়গুলো ওরা হাঁড়িয়া খাবার জন্যে ব্যবহার করে। ভাবলাম রুচি ভেদে একই পাত্র কেমন ভিন্ন ভাবে ব্যবহৃত হয়। বন্য রমণীর এই পরিশীলিত রুচি আমাকে সেদিন অবাক করেছিল। এটা কি খ্রীস্টধর্মের প্রভাব না ধর্মযাজক জীবনের মৌলিক চাহিদা সম্পর্কে এ রমণীকে সচেতন করেছেন। অবশ্য আমাদের এ দেশী খ্রীস্টধর্মাবলম্বীদের ভেতর এ ধরনের জীবন যাপনের ছাপ আমি দেখেছি। ধর্ম যদি জীবন ধারনের অঙ্গ হয় তাহ'লে প্রভাব অবশ্যম্ভাবী।

মেমসায়েব আমাদের চা দিতে চেয়েছিলেন। সসঙ্কোচে বিনয়ে মাপ চাইলাম। অবশ্য এ রীতি আমার বোন পছন্দ করে না।

অনেক জায়গায় ভদ্রতা করে 'খাবোনা বলা' বা 'খাবার কমিয়ে দিন' বলায় ওখান থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে লাঞ্ছিত হতে হয়েছে ওর কাছে। তবুও এখানে চা খেতে পারলাম না। মনে হয় মহিলার এতো কৃতিত্ব সত্ত্বেও ওকে ঠিক সহজ ভাবে আমি নিতে পারছিলাম না। নানা আলাপের ভেতর যে কথাটা স্পষ্ট হয়ে উঠলো তাহ'চ্ছে বালীর মাকে বলে তাঁর কাছে নিয়মিত লেখাপড়ার জন্যে বালীকে পাঠানো। এর ভেতর দু'দিন নাকি বালী মার কাছে ঠ্যাঙ্গানী খেয়েছে। চতুর বালী ভেবেছে আমি বললে ওর মা বারণ করতে পারবে না কারণ আমি তার মনিবকন্যা। ব'ল্লাম, 'বেশ তো আমি ওর মাকে বলবো।' বালী মুখ ঝামটা দিয়ে বললো, 'ও কথা ব'লো না মেমসাব, মা আসতে দেবে না। তবে আমি দিদির ঠাঁই বলছি আমি পালিয়ে পালিয়ে আসবো তোমার কাছে মেমসায়েব। বড় হলে আমি তোমার মত কেরেস্তান হয়ে যাবো। ইমুন সোন্দর করে থাকবো।' কেমন যেন অস্বাছন্দ্য বোধ করতে লাগলাম। নমস্কার করে বেরিয়ে এলাম। দরজায় দাঁড়িয়ে মেমসায়েব বল্লেন, 'গুড্ বাই, সি ইউ'। মুখ থেকে বাক্যি সরলো না। বেরিয়ে এলাম। ভাবলাম অজিত রায়ের কথা। আমাদের পরিবারিক বন্ধু ছিলেন। তাঁকে বিলেত যাবার লোভ দেখিয়ে খ্রীস্টান করেছিলেন মিস্ ডেভিস্, আমাদের আদরের পিসিমা। কিন্তু অজিত রায় শেষ পর্যন্ত তাঁর কৃপাপ্রার্থী হয়েই ছিলো, বিলেত আর যাওয়া হয়নি। বালীও কি অমনি কোনও সোনার হরিণের স্বপ্ন দেখছে। মিশনারী স্কুল কলেজে পড়েছি। ওদের ধর্মতত্ত্ব, জীবনতত্ত্ব এবং রাজার জাতের সঙ্গে আমাদের ব্যবধান বুঝেছি। 'আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়' বলে কপাল চাপড়াতে অনেককেই দেখেছি, তবুও তো ধন্য আশা কুহকিনী ব'লে তাবে মায়াজালে মানুষ ঝাঁপ দেয়।

এ কথা সত্যি ধর্ম কখনও মন্দ কথা বলেনা। সব ধর্মের সারাৎসার সত্যানুসন্ধান। তবে ধর্মের আচার নিষ্ঠা অপরের পক্ষে রপ্ত করাটা কঠিন। খ্রীস্টান হওয়া যতো সহজ, সঙ্গে সঙ্গে গাউন পরাটা কি ততো সহজ। কিন্তু পরতে হয় নানা কারণে। আমার সঙ্গে ভায়োলেট ম্যাক্‌ডোল্যাণ্ড বলে একটি মেয়ে পড়তো। গায়ের রঙ্ কালো কিন্তু মুখশ্রী ভারি সুন্দর। ও আমাকে বলেছিল ওর একটা বাঙালী

নাম আছে 'অজিতা' বলতাম, 'ভায়োলেট তুমি কেন ও নামটা ব্যবহার করো না। কেন শাড়ী পর না?' ভায়োলেট জবাবে বলেছিল শাড়ী পরলে আর অজিতা নাম নিলে ইঙ্গবঙ্গদের জন্য বরাদ্দ চাকরি পাবে না। ওদের বাড়ীতে গেছি, ওর মাকে দেখেছি পায়ে খড়ম, গাউন পরা। আসলে রুটি রুজির যোগাড় করে যে আচরিক ধর্ম, সেটাই মানুষের কাছে মুখ্য।

সেদিন বালীর চোখে আমি উচ্চাশা ও লোভের প্রথম আগুন জ্বলতে দেখেছিলাম। জানিনা পরবর্তীকালে কিসের আকর্ষণ বালীকে হাওয়াই দ্বীপে উড়িয়ে এনেছে। তবে এ কথা সত্যি সাধারণ কোল মেয়েদের তুলনায় ও ছিল একটু ভিন্ন ধরনের স্বাধীনচেতা ও উচ্চাভিলাষী। আমার কাকাকে বললে হাসতেন। সম্ভবত বালী কোনও কোল পিতার সন্তান নয়। আমাদের কালে বাপ মায়ের সঙ্গে সব ব্যাপারে এতো খোলাখুলি আলাপের সুযোগ ছিল না। তাই কৌতূহল লাগলেও ওর জন্ম রহস্য উদ্‌ঘাটন সম্ভবপর হয়নি অথবা যতোটা কৌতূহল ছিল আগ্রহ ততোটা ছিল না।

সব ব্যাপারেই ছিল ওর অদম্য উৎসাহ। বিরক্ত হ'তাম, ধম্‌কে দিতাম; একটু মুখ কালো করতো, পর মুহূর্তে সেই বকবকানি। একদিন খুব উত্তেজিত হয়ে বললো, 'দিদি রাজকুমার আসবে তোমাদের বাড়িতে।' ব'ল্লাম, 'সে আবার কি? রাজ কুমার কোত্থেকে আসবে।' বললো, 'অপিসঘরে বাবুকে খবর দিয়ে গেল। আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। শুনে নিয়েছি।' উত্তেজনায় ও রীতিমত কাঁপছে। উত্তেজনার ছোঁয়া আমাদেরও লাগলো। রাজপুত্তুর, সেতো সোজা কথা নয়। শুনলাম বিকেলে বনাইগড়ের রাজপুত্র আসবেন। আমাদের কাছাকাছি বনাইগড় নামে একটি ছোট দেশীয় রাজ্য ছিল। তাকে রাজ্য না বলে জমিদারী বলাই ভাল। তবুও রাজা সাহেব যখন আছেন তখন রাজকুমারও থাকবেন, এ আর বিচিত্র কী। রাজাসাহেব ছিলেন ভাল শিকারী। আমার বাবারও শিকারে প্রচণ্ড উৎসাহ ছিল। প্রতি বছর শীতকালে বাবা সুন্দরবন যেতেন, সঙ্গে মা। মাঝে আমরা সঙ্গ পেতাম। এখানে এলে রাজা সাহেবের সঙ্গে অন্তত একবার শিকারে যেতেন। তাঁর ছেলে আসবে। অতএব আদর যত্ন করতে হয়, কারণ বাবার কাছে রাজবাড়ির প্রচুর গল্প শুনেছি। কাকা আপ্যায়নের আয়োজন করলেন অত্যন্ত সাধারণ ভাবে। দু'বোনে

খুঁত খুঁত করলাম, কিন্তু লজ্জায় অতি উৎসাহ দেখাতে পারলাম না। দু'বোনে প্রাণপণে নিজেদের ঘষলাম, মাজলাম যদিও জানি প্রতি-যোগিতায় ছোট বোনের সঙ্গে পেরে উঠবো না, কারণ ও যথার্থ অর্থে সুন্দরী আর আমি জ্ঞান হওয়া অবধি শুনছি, 'অমন বাপ-মায়ের ঘরে এ কালী ঠাকরুণ এলো কোত্থেকে? তবুও ক্ষীণ আশা, আমি উচ্চ শিক্ষিতা এম.এ. পাস আর বোন আই.এ. পড়ে। রাজকুমার যদি বিদ্যের কদর করেন তবে আমার ভাগ্যে শিকা ছিঁড়লেও ছিঁড়তে পারে।

প্রতীক্ষার অবসান হ'ল। রাজপুত্র এলেন। আমাদের চলতি ভাষায় রূপ বর্ণনা করতে হলে বলা যায় ছাইমাখা শিং মাছ। মিশমিশে কালো রঙ, তার ওপর চাপচাপ সাদা পাউডার। পরণে ধুতি, টাইট কাছা। উড়িয়া বাংলা মিশানো ভাষায় কি বল্লেন, বুঝলাম না ঠিক, তবে রাগে দুঃখে তখন মরিয়া হয়ে উঠেছি। কপাল, গাল, ঘাড় তখনও সাবান ঘষার ফলে জ্বালা করছে। রাজা পকেট থেকে বটুয়া বের করে যাঁতি দিয়ে সুপুরী কাটতে শুরু করলেন। তাকিয়ে দেখি ছোট বোন অনেক আগেই বোধ হয় উঠে গেছে। আমার উচ্চশিক্ষা আমাকে উঠতে দেয়নি। এবারে হাত জোড় করে মাপ চেয়ে উঠে দাঁড়ালাম। রাজকুমারের ভ্রূক্ষেপও নেই তাতে। বালী কিন্তু ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইলো কুমারের খেদমতের জন্যে। পরে আধারাত পর্যন্ত কুমারের বর্ণনায় খৈ ফুটেছে ওর মুখে। ধমক খেয়ে তবে ঘুমিয়েছে। আজ মনে হচ্ছে ধন ঐশ্বর্যের প্রতি বালীর আকর্ষণ বরাবরই ছিল, হয়ত সেই মোহই ওকে এখানে টেনে এনেছে।

ওর উস্কানীতে আমরা গভীর জঙ্গলে যাবার বায়না ধরেছি। রাতে ঘন্টার পর ঘন্টা বিকলযন্ত্র গাড়ীতে হেডলাইট জ্বেলে বসে থেকেছি বুনো জানোয়ারের ভয়ে। একবার প্রচণ্ড শীত পড়েছে। ঘরের ভেতর কাঠকয়লার বড় একটা টিনের চুলা ঘর গরম হবার জন্যে। বিছানায় গরম জলের ব্যাগ। পাশ ফিরলে মনে হয় ঠাণ্ডা জলে পড়লাম। হঠাৎ প্রচণ্ড গর্জন, বাঘ ডাকছে। বোনটি আমার বড্ড ভয় কাতুরে। কলকাতায় সাইরেন বাজলে ওর দুপাটি দাঁতের শব্দ সঙ্গীত-মূর্ছনার সৃষ্টি করতো। শীত ভুলে লাফ দিয়ে আমার বিছানায় এসে আমাকে জড়িয়ে ধরেছে। আমারও

বাক্‌শক্তি নেই। বালী মেঝেয় আগুনের কাছে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। কয়েকবার ডাকতে বললো ও, 'চুপ মেরে শুয়ে থাক। ও ডাকছে ঠাকুরাণী পাহাড়ে।' ঠাকুরাণী পাহাড় আমাদের বাড়ির বারান্দা থেকে দেখা যেতো। ভোরে চায়ের পেয়ালা হাতে ঠাকুরাণীর আত্মপ্রকাশ উপভোগ করতাম। কেমন করে কুয়াশা ঢাকা ঠাকুরাণী আস্তে আস্তে তার স্বরূপে উদ্‌ভাসিত হোত, তার বুকের গাছপালা সৃষ্ট হত—সত্যিই সে সৌন্দর্য ভুলবার নয়। দূরত্ব ছিল প্রায় ছ'সাত মাইলের মত। আমাদের কিন্তু মনে হ'ল বাঘ ডাকছে জানালার কাছে। একবার আমার মা সকালে দেখলেন বারান্দায় কুকুরের শেকল ছেঁড়া। নট বললো, 'মা রাতে ওটাকে বাঘে নিয়ে গেছে।' মা সেদিনই ফিরে এসেছিলেন। আমার বোন বোধ হয় মায়ের রাশিতে জন্মেছে। পরে একদিন দেখেছিলাম জোড়া বাঘ। ফ্রিম্যান সায়েব অর্ধেক রাতে আমাদের ডেকে তুললেন, বাঘের পেট তখনও ওঠানামা করছে। সেও এক অভিজ্ঞতা বটে। মিঃ ফ্রি-ম্যানের দৌলতে বাঘের নখের লকেট আর ব্রোচ্ অনেক পরেছি। ভাবতে ভাবতে অনেক রাতে কখন চোখের পাতা লেগে এসেছে জানিনা।

পরদিন বিকেল পাঁচটায় বালী ঠিক এসে হাজির হ'লো। কিন্তু মুস্কিল হ'ল এ্যানকে নিয়ে। ও আমাকে একা এক অপরিচিতার সঙ্গে ছাড়বে না। বালী তার পুরা আমেরিকান ঠাঁটের বাচনভঙ্গীতে এ্যানকে বললো, 'তুমিও চলো, এক কাপ কফি বা অন্য কিছুর স্বাদ নিয়ে আসবে।' এ্যান রাজী হ'ল। ওর গাড়ির সামনের সীটে আমাকে পাশে বসালো, এ্যান পেছনে। আমাদের হোটেল থেকে আধা কিলোমিটারের ভেতর বালীর বাড়ি। মনে হ'ল একটি সাইকেলের পেছনে বসবার জন্য বালীর কি আকুতি ছিল, কতো হাতে পায়ে ধরেছে, আর আজ ও এক বিরাট গাড়ি চালাচ্ছে যার নামও আমি জানিনা। তাহ'লে আমাকে দেখে বালী সেদিন কাঁদলো কেন? ওকি সুখী না? না উড়িষ্যার রীতি পালন করলো। উড়িষ্যায় নিয়ম আছে অনেক দিন পর দেখা হ'লে কাঁদতে হয়। মেয়ে হয়ত এক বছর পর শ্বশুর বাড়ি থেকে এসেছে। বাড়িতে মড়াকান্নার রোল। কতো দেশে কতো রকম আচারই না আছে।

ছবির মতো একটা ছোট বাংলো বাড়ী। বাগানে অজস্র ফুল। দেখে মনে হ'ল যথেষ্ট পরিচর্যা হয় বাগানের। ঘরে ঢুকে থমকে গেলাম। সেই মিশনারী মহিলার কথা মনে পড়লো। সুন্দর সুরুচি-সম্পন্না একজন আমেরিকান মহিলার ঘর ; দেওয়ালে টাঙ্গানো শিশু-কোলে মা মেরী। মুহূর্তে তুলনা করলাম আমার বাসগৃহের বসবার ঘরের সঙ্গে। একটু ঈর্ষা কাতর হ'লাম কি ? না ; বালী বেশী ভাবতে সময় দিলোনা। অত্যন্ত ভদ্রভাবে এ্যানকে বসতে বলে আমাকে বললো, 'দিদি, এ তোর বালীর নিজের ঘর। তোরও ঘর। যেখানে যেমন ভাবে ইচ্ছে বোস।' কফি এলো, সঙ্গে আনু-ষঙ্গিক। এ্যান খাদ্যদ্রব্যের সুনিপুণ সদ্ব্যবহার করলেও হাওয়াইয়ান অথবা ভারতীয় যাই হোক না কেন বালীর সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখেই ব্যবহার করলো।

কফি খাওয়া শেষ হ'লে এ্যানকে ব'ল্লাম, 'এই মহিলা আমাকে রাতে হোটেলে ছেড়ে আসবে। তোমাকে আর আসতে হবে না। আর আমার জন্য অপেক্ষা করোনা আমি খেয়েই ফিরবো।' কথায় বলেনা 'আক্কেলমন্দ কি দিয়ে ইসারা কাফি হ্যায়' এ্যান বুঝলো আমি একা বালীর সঙ্গে কথা বলতে চাই। দ্রুত উঠে দাঁড়াল, 'আচ্ছা আসি, বেশী রাত করোনা তাহ'লে আবার আমাকে আসতে হবে।' কোনও মতে বালীকে একটা অস্ফুট ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে গেল। আমি ওর ব্যব-হারে একটু লজ্জা পেলাম। বল্লাম, 'মেয়েটা তো বেশ ভাল তবে এমন অভদ্র ব্যবহার করলো কেন ?' বালী বেশ সশব্দে দরজাটা বন্ধ করলো, মনে হয় শব্দ দিয়ে এ্যানের ব্যবহারের জবাব দিল। তারপর জুতোটা খুলে কার্পেটে আমার পায়ের কাছে বসে কোলের ভেতর মুখ গুঁজে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো। আমি আস্তে করে ওর মাথায় হাত বুলোলাম। কাঁদুক, ওর বুকের ভাব কমে যাক। তখন ও নিজেই কথা বলবে। মিনিট পাঁচ ছয় পরে উঠে গেল। বুঝলাম চোখে মুখে জল দিতে গেছে। না শুধু জল দেওয়া নয় নতুন করে প্রসাধনও সেরে এসেছে।

এবারে শুরু করলো, 'দিদি, তোকে দেখে আমার ত্রিশ বছরের ফেলে আসা সব দুঃখ, কষ্ট, সুখ, আনন্দ এক সঙ্গে জড়িয়ে ধরছে। ছোট বেলায় তোর কাছে রামায়ণের গল্প শুনতাম অশোক বনে বন্দিনী সীতার কথা। কিন্তু আমায় তো কোনও রাক্ষস ধরে আনেনি।

আমি নিজে এসেছি তুই তো সবার মাঝে আছিস'। বলে আবার ও কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো। এবার আমি ধমকে উঠলাম, 'তুই কান্নাকাটি করলে আমি ঠিক চলে যাবো। স্থির হয়ে বোস তো। আমার কথার জবাব দে। তুই কি বিয়ে থা করেছিস? ছেলে মেয়ে আছে। পিয়ানোর ওপর কার ফটো? মেয়েটি কে?'

হাওয়াই দ্বীপের বালী তার চোস্ত আমেরিকান এ্যাকসেন্টে কাহিনীটা বলে চললো যার অনুবাদ এমনিই দাঁড়ায়! 'শেষবার তোরা চলে এলি চুয়াল্লিশ সালে না? বল্লাম, 'না তেতাল্লিশের শেষে।' 'হুঁ, তারপর থেকেই আমি নিয়মিত মেমদিদির, কাছে যেতাম। ইংরাজী লিখতে পড়তে ও বলতে শিখলাম। কাঁটা চামচে কি করে খেতে হয় মেমদিদি তাও শেখালো। মা মাঝে মাঝে টের পেয়ে আমাকে জন্তুর মতো পেটাতো। একদিন গিয়ে মেমদিদিকে যাচ্ছেতাই গালাগালি দিয়ে এলো। মেমদিদিরও জিদ চেপে গেল। একদিন বললো, বালী চাকরি করবি? আমিতো আনন্দে উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠলাম, কি চাকরি মেমদিদি? মিলিটারীতে, নার্সের চাকরি, মেমদিদি হেসে হেসে বল্লেন। মনটা খারাপ হয়ে গেল। নার্সের কাজ তো কিছু জানিনা। মেমদিদি বল্লেন, ওরা শিখিয়ে নেবে। কলকাতায় যেতে হবে। সেই স্বপ্নের ক'লকাতা! উত্তেজনায় কথা বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু হঠাৎ ভেঙ্গে পড়লাম মা? মা তো যেতে দেবেনা। মেমদিদি বললো, মাকে জানাতে হবে না। গিয়ে চাকরি করে টাকা পাঠাস, তাহ'লেই মা খুশী হয়ে যাবে। তবুও ভাবলাম মাকে বলেই যাবো। রাগারাগি করে করুক, তবুও লুকিয়ে যাবোনা।

বাড়ি এসে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মনের কথা মনেই চাপা দিতে হ'ল। হয়ত বা মায়ের মনে কিছু আগাম দিয়েছিল। ঐ দিনই সন্ধ্যায় মা আমাকে কাছে ডাকলেন। হঠাৎ বুকের ভেতর টেনে নিয়ে কাঁদলেন। বল্লেন, বালী বড় ইচ্ছে ছিল তোকে লেখাপড়া শেখাবো। দিদিদের মত বড় হবি, চাকরি করবি। তারপর আমরা এ দেশ ছেড়ে চলে যাবো। কিন্তু তা আর হ'ল না। মার পরিবর্তনে অবাক হ'লাম। জ্ঞান হবার পর মা আমাকে কখনও আদর করেনি। জানি আমার বাবার ওপর মায়ের প্রচণ্ড অভিমান ছিল। বাবা মাকে

প্রতারণা করেছে। আমার জন্মের পরই মাকে রেখে বিদেশ চলে গেছে। আর ফিরে আসেনি। অবশ্য এটা মায়ের কথা। সত্যি ঘটনা কি আমি আজও জানিনা। মা সব দুঃখ কষ্টই নিজের বুকে নিজেই চেপে রেখেছিল। মাঝে মাঝে শুধু খুব বড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলত। মাকে এমন আবেগ উচ্ছল দেখে আমি সাহস করে বল্লাম, মা আমি কিছুটা লেখাপড়া শিখেছি। তাই দিয়েই রোজগার করতে পারবো। মেমদিদি বলেছে আমাকে কলকাতায় নার্সের চাকরি দেবে। তাতেই দু'জনের...কথা শেষ করতে পারিনি। মা উন্মাদিনীর মত ক্ষেপে উঠলো। দু'হাতে আমার চুল ধরে টেনে বিছানার ওপর ফেলে যতো পারলো কিল চড় থাপ্পড় দিল। তারপর মাটিতে গড়িয়ে শিশুর মত কাঁদতে লাগলো। পরদিনই আমি ঘর ও বড়বিল চিরদিনের মত ছেড়ে আসি। এটুকুই বুঝলাম, মার ভালবাসা মাকে ফাঁকি দিয়ে কলকাতায় চলে এসেছিল। তার দ্বিতীয় প্রজন্মের ভালবাসাও সেই কলকাতায় এসেই মরল। মেমদিদি আমাদের ট্রেনে তুলে দিল। আমার সঙ্গে আরও দুটো মেয়ে ছিল একটা কইড়ার আর একটা কেউনঝাবগড়ের। দু'জনই আমার থেকে বয়সে পাঁচ থেকে দশ বছরের বড়। ও জায়গাগুলোর কথা তোর মনে আছে দিদি ?

উত্তরের অপেক্ষা করলো না বালী বড়বিলের ঝরণার মতোই তার বাগ্‌ধারা প্রবাহিত হয়ে চললো। এবারে মুখ খানা মলিন মনে হ'ল, 'ওরা দু'জনেই ট্রেন ছাড়তে খুব কান্নাকাটি করছিল কিন্তু জানিস দিদি আমার চোখ থেকে এক ফোঁটা জলও সেদিন গড়ায়নি—না মায়ের জন্য, না বড়বিলের জন্য। ভাবছিলাম কলকাতায় যাবো, টাকা রোজগার করবো। মাকে পাঠাবো, তারপর তো মা আমার কাছেই চলে আসবে। দুঃখিনী মায়ের সাধ আমি পূর্ণ করবো। মা আর বাড়ি বাড়ি জল টানবে না। কাষ্ঠ কুড়াবে না, পাতা জ্বালিয়ে একদিন ভাত রেঁধে পানি মিশিয়ে তিনদিন খাবে না। তখন জানিনি দিদি মেয়েদের ইচ্ছা কখনও পূর্ণ হয়না, তাদের সাধ আহলাদ সবই পুরুষকে জড়িয়ে। আর সে-বন্ধন স্বীকার না করলে বালীর মত নিঃস্ব রিক্ত হয়ে যাও। দিদি, আমি আজ একটা ন্যাড়া গাছ। না আছে লোককে আশ্রয় দেবার মত ডালপালার

ছায়া, না ধরে এতে লোককে আনন্দ দেবার মত ফুল। আজ ক্ষুধা তৃপ্তির জন্য সব ফলই তো একজনকে দিয়ে দিয়েছি।'

একটা বুকভরা শ্বাস নিলো বালী, তারপর চুপ করে রইল। ওর সে মুখের দিকে আমি চেয়ে রইলাম। পরে বল্লাম, 'আচ্ছা বালী, তোকে যে আমি এক আমেরিকান মিলিটারীর সঙ্গে দেখেছিলাম, তুই তখন পুরা মেমসায়েব। আমাকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলি। ও কে ছিল?' 'হবে কোন টম, হ্যারী ডিক। কলকাতায় পৌঁছাবার পর আমার চাকরির চেহারা বদলে গেল। নার্সিং মিথ্যে কথা। ওই মিষ্টি কথার কালীমেম আসলে ছিল একটা আড়কাঠি। মেয়ে ধরে ধরে পাঠাতো। প্রথম প্রথম মনে হ'তো নরক যন্ত্রণা। তারপর সয়ে গেল। পাপের টাকা মাকে পাঠাবো না ভাবলাম, কিন্তু ছ'মাস পর পাঠালাম। টাকা ফেরত এলো। মনি অর্ডার ফর্মে বাবুর হাতের লেখা ঃ 'এ্যাড্রেসী নট ফাউণ্ড'। তারপর চিঠিও লিখেছি বাবুকে। উত্তর পাইনি। মনে হয় মা ওখানেই আছে. কিন্তু আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে না বা আমার টাকা নেবেনা। নাই নিলো—তখনকার আমার মনোভাবটা ছিল এই রকম।' 'তাহ'লে ও জীবন তোর খারাপ লাগেনি বল?' 'কি যে বলিস দিদি, মাস ছয়েকের ভেতরই নিজেকে ঘেন্না করতে শিখলাম। শুধু কলকাতা নয়, আমাদের বাইরেও নিয়ে যাওয়া হতো সৈন্যদের আনন্দ দেবার জন্য। অর্ধউলঙ্গ নাচ, হৈ চৈ গান পরিবেশন তারপর দেহটাকে ক্ষুধার্ত নেকড়ের হাতে ছেড়ে দেওয়া।'

'আচ্ছা তোর যদি ও জীবন এতো খারাপই লেগে থাকে তাহ'লে চলে এলি না কেন?' অধীর আগ্রহে বালীর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। ম্লান হেসে বালী উত্তর দিলো' 'পেটের জ্বালা কি তা তোর জানা নেই দিদি। কতোদিন আমি আর মা একমুঠি ভাত এক হাঁড়ি পানিতে চটকে চুমুক দিয়ে খেয়ে কাজে গেছি। তোরা না থাকলে, কাজ না পেলে উপোস করে থেকেছি। কলকাতার পথে তখন স্তূপীকৃত লাশ। মানুষ, কুকুর, বেড়াল খাবারের ঠোঙ্গা নিয়ে ডাস্টবিনে উপুড় হয়ে মারামারি করছে। ফিরে কোথায় যাবো দিদি? তবে একটা কথার জবাব তুই আমাকে দে আমরা তো পেটের দায়ে এ কাজ করেছি, কিন্তু তোদের মত স্কুলে কলেজে ইউনি-

ভার্সিটিতে পড়া মেয়েদের আমি ব্রিস্টল, ব্রডওয়ে বা তার চেয়েও ছোট হোটেলে দেখেছি। তারা কেন ওখানে আসতো বলতো?' 'বালী', গভীর স্বরে উত্তর দিলাম, 'ওরাও তোর মত না খেয়েই এসেছে।' 'বিশ্বাস করিনা তোর কথা', আবেগে মাথা ঝাঁকালো বালী, আমি ক্রিস্টোফারের কাছে এমন অনেক মেয়ের কথা শুনেছি। তবে ওরা তো তোদের সঙ্গে মিশে আছে। আমি কেন নষ্ট মেয়ে-মানুষ হ'লাম। কেন আমার মায়ের মুখ দেখতে পেলাম না। কেন, কেন আমার মায়ের কাছে যেতে পারি না? তুই তো অনেক পড়া-লেখা করেছিস। আমার কথার জবাব দে? হিস্টিরিয়ার রুগীর মতো বালী দু'হাতে আমার কাঁধ ঝাঁকাতে লাগলো।

আস্তে ওর হাত দুটো টেনে ওকে পাশে বসালাম। 'বালী, সব কেন্‌র উত্তর আমার জানা নেই, কারণ আমার মনের ভেতর শত সহস্র প্রশ্নবোধক চিহ্ন আমাকে অহোরহ পীড়িত করছে। একি একের কর্মফল না ভাগ্য না মানুষের অত্যাচার উৎপীড়ন। তবে একটা কথা জেনে রাখিস সমস্ত পৃথিবীতেই সমাজ দরিদ্র, অক্ষম, অসহায়ের জন্য। তাই তুই নির্যাতিতা। ধনীর সমাজ তার নিজের ইচ্ছায় চলে আর দুর্বলকে সমাজ চালায়।' হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে ওঠার মতো ভঙ্গীতে বললো, 'একটা কথা বলি, রাগ করবি না? করলেও তোকে বলবো, 'তোর সঙ্গেও তো সেদিন এসপ্লানেডে খাকী পরা একটা লোক দেখেছিলাম। তবে সে ছিল কালো আদমী। তোর তো কিছু হয়নি। তুই তো দিব্যি আছিস।' ম্লান হেসে বল্লাম, 'ত্রিশ বছর ওর ঘরেই আমি আছি বালী।' 'সত্যি ওটা আমার জামাইবাবু ছিল?' বালী উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালো। 'আমি তখন থেকে বকে যাচ্ছি। তোর কথা তো কিছুই জিজ্ঞেস করিনি।' 'কফি দে বালী' গলা শুকিয়ে গেছে। বালী দ্রুত উঠে চলে গেল।

আমি জালনার কাছে এসে কাচটা তুলে দিলাম। সুন্দর ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে, আকাশে থালার মতো একটা চাঁদ? প্রকৃতিকে যেন ধুয়ে মুছে সাফ করে দিচ্ছে। আবেশে চোখটা বুজে এলো। এ চাঁদ তো বড়বিলের আকাশেও উঠেছে, ঢাকাতেও। একটা যোগসূত্র আছে তাহ'লে। 'কফি নে, ওকি জানালা খুলেছিস কেন? গরম লাগছে বলবি তো? দাঁড়া তোকে ঘর ঠাণ্ডা করে দিচ্ছি।' 'না না, এটাই আমার ভাল

লাগছে।' বাধা দিলাম বালীকে। 'পাগল নাকি? এ সময়ে এয়ার গলুশানের জন্যে আমরা গাড়ীর জানালা পর্যন্ত খুলি না, ঘর তো দূরের কথা।' অবাক হ'লাম এই সেই বন্য কুরঙ্গিনী—খাঁচায় বেশ মানিয়েছে তো।

কফির স্বাদ নিয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে ব'ল্লাম, 'এবারে বল এখানে এলি কি করে?' 'সে কথাই তো তোকে বলবার জন্যে ধরে এনেছি। হ্যারী, জন, ডিকদের ভিড়ে হঠাৎ খড়গপুরে একটা মানুষের সঙ্গে পরিচয় হ'ল। ওর নাম ক্রিস্টোফার উইলিয়াম। মেজর উইলিয়াম আমেরিকান। আমরা বলতাম ইয়াঙ্কি সোলজার। ও আমাকে ভালবাসলো দিদি। এক বছর দেহ বিক্রীর পর আমি মনকে জানলাম। নিজেকে আবিষ্কার করলাম দিদি। এতো ভাল মানুষ বাসতে পারে, বালীও ভালবাসতে পারে। এ আমার এক বিস্ময়। ও আমাকে কলকাতার এন্টালীতে এক এ্যাংলো পরিবারে রাখলো। সায়েব কলকাতায় থাকলে আমি ওর কাছে থাকতাম আর না হ'লে মিসেস গোমেসের বাসায়। ভদ্রমহিলা খুব ভাল ছিলেন। নিঃসন্তান। আমাকে মেয়ের আদরে রেখেছিলেন। ওঁর কাছে আরও লেখা-পড়া শিখলাম, শিখলাম পিয়ানো বাজাতে। কি করে খেতে হয়, বসতে হয়, হাসতে হয় সবকিছু শিখিয়েছেন আমাকে মামী। ওই সম্বোধনই করতাম তাকে। আজও তাঁর চিঠি পাই দিদি। ওটুকুই আমার দেশের সঙ্গে যোগসূত্র।

ক্রিস্টোফার কথা দিয়েছিল আমাকে আমেরিকায় নিয়ে যাবে। বিয়ে করবে। মামী কিন্তু সব সময়ে বলতেন, 'বালী বিয়ের কথা ভুলে যাও। নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখো।' টাইপ করতেও তিনিই আমাকে শিখিয়েছিলেন। স্বপ্নের ভেতর দিয়ে একটা বছর কেটে গেল। যুদ্ধ শেষ হয়ে এলো। এবারে আমরা আমেরিকায় ফিরবো। ইংরাজী বলতে পারলেই যে সব জানা যায় না সেটা বুঝলাম যখন মামী বল্লেন আমেরিকান সৈন্যরা কোনও এদেশী মেয়েকে বিয়ে করতে পারবে না; আর করলেও দেশে নিতে পারবে না। আমি তো ক্রিস্টোফারকে মেরে ধরে চুল ছিঁড়ে একাকার করলাম। ও মুখ বুজে মলিন মুখে সব সহ্য করলো। তারপর ক'দিন উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরে মামীকে এসে বললো ও আমাকে ওখানেই রেখে যাবে। ছ'মাসের

মত খরচও দিয়ে যাবে ; এর ভেতর সে আমাকে নেবার একটা পথ করবে। খিদিরপুর থেকে ওর জাহাজ ছেড়ে গেল। চোখের জলে ওকে বিদায় দিয়ে এলাম। সপ্তাহ খানেক পর মনে হ'ল অনেকটা সামলেছি। মার কাছে যাবার সম্ভাবনা চিন্তা করেছি, কিন্তু নিজের কাছে উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া পাইনি। মামী আমাকে একটা ছোট ফার্মে টাইপিস্টের কাজ জুটিয়ে দিলেন। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ছিলেন। জানতেন ওই টাকা ফুরিয়ে যাবার পরও যদি আমেরিকা যাবার ব্যবস্থা না হয় তাহ'লে ? তাছাড়া চাকুরীটা থাকায় আমার নিঃসঙ্গতা অনেক কম মনে হ'ল।

ক্রিস্টোফার কথা রেখেছিল। টাকা পাঠালো। মামী আমার যাবার সব ব্যবস্থা করে দিল। ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে আমি ন্যুইয়র্কে পৌঁছালাম। ক্রিস্টোফারের বুকে আশ্রয় পেলাম।

নতমুখী বালী যেন কোন স্মৃতির সাগর থেকে মণিমুক্তা আহরণ করছে। তাকিয়ে দেখলাম ওর দু'গাল বেয়ে নেমেছে গঙ্গা-যমুনা। রুমাল নিয়ে নাক মুছতেই আমি একটা সুযোগ পেলাম প্রসঙ্গ ও পরিবেশ বদলাবার। বল্লাম, 'বালী অমন ফোঁস করে নিঃশ্বাস নিলি কেন—তুই কি বিন্দাবনের মোষ?' চোখে জল নিয়ে বালী হেসে গড়িয়ে পড়লো, 'দিদি, তোর সব মনে আছে ?' 'কেন থাকবে না, মনে রাখার মত ঘটনা হ'লে মনে থাকবেই।' একদিন অনেক রাতে আমার হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। খুব জোরে জোরে কে যেন নিঃশ্বাস নিচ্ছে। বালীকে ডাকলাম। ও কান খাড়া করে বললো, 'ঘুমিয়ে থাক, কথা বলিসনা। ওগুলো বিন্দাবনের মোষ, ধান খাচ্ছে।' বিব্রত হ'লাম। বিন্দাবনের মোষ ওর যত্নে চাষ করা ক্ষেতের পাকা ধান খাচ্ছে আর বিন্দাবন ঘুমুচ্ছে। অন্য দিনে তো ওর কাণেস্তারা পিটাবার শব্দে ঘুমুতে পারি না। বল্লাম, 'ওঠ না, দরজা খোল বিন্দাবনকে ডাক।' বালী ঘুরে শুলো, বললো, 'বিন্দাবনকে এখন ডাকতে গেলে যমের বাড়ি যেতে হবে।' একটা জড়াজড়ি, ধস্তাধস্তির শব্দ যেন কানে এলো। ভয়ে বিছানা আঁকড়ে পড়ে রইলাম। কিছুক্ষণ পরেই বিন্দাবনের আর্তনাদ শুনলাম। সকালে দেখলাম সমস্ত ক্ষেতখামারের উপর দিয়ে যেন কাল বৈশাখের দাপট গেছে। রাতে হাতির পাল এসেছিল।

বিন্দাবনের সর্বনাশ করে গেছে। আমাদের বাড়ির সামনে বড় বড় পায়ের দাগ। এ অভিজ্ঞতা কি ভোলা যায়?

বালী তখন হাসতে হাসতে চোখের জল মুছে ফেলেছে। বল্লাম, 'সামনে কিছু দে।' 'আমি দুঃখিত', বলে এবারে ঠাণ্ডা পানীয় নিয়ে এলো। ব'ল্লাম, 'কটা বাজে?' 'মাত্র সাতটা, কেন কোথায়ও যাবে নাকি?' নারে, এমনিই। আজ সন্ধ্যাতো তোকে উৎসর্গ করেছি।' 'কেন করবে না? আমি তোমাকে খুঁজে বের করেছি না? তুমি তো না চেনার ভান করে আমেরিকান মেম সায়েবের গাউন ধরে চলে যাচ্ছিলে', কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে ঠোঁট বাঁকালো বালী। 'মিথ্যে কথা বলিস না বালী, মেম সায়েবের গাউন ছিল না, ছিল জিনস্?' আবার কাঁচভাঙ্গা হাসি হাসলো বালী। 'সত্যিই দিদি অবাক হয়ে ভাবি কি সাহসে ভর করে এতোদূর এসেছিলাম। কেমন করে ক্রিস্টোফারকে বিশ্বাস করেছিলাম। কিন্তু জানিস দিদি ক্রিস্টোফার ওর কথা রেখেছিল। বিয়ের জন্য দু'জনে খুব ব্যস্ত হয়ে গেলাম। একদিন ও আমাকে গির্জায় নিয়ে গেল আমি ওর ধর্মকে দু'হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিয়ে আমাদের হ'লো না। অথচ দু'জনের জীবনকে আলোর সুধায় ভরিয়ে দিয়ে এনা এলো আমাদের মাঝখানে হাইফেনের সংযুক্তি নিয়ে।'

'কেন? বিয়ে হ'লনা কেন?' উদগ্র ঔৎসুক্য নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম। মাথা নীচু করে বালী কিছুক্ষণ নিরুত্তর রইল। তারপর বললো, 'গায়ের চামড়ার রঙ দেখছো না দিদি। ক্রিস্টোফারের বাবা, মা, আত্মীয়-স্বজন ওর সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করলো। ও রাগ করে চলে এলো এই হাওয়াই দ্বীপে। আমরা সুখের নীড় রচনা করলাম। বিয়ের কথা বললে ক্রিস্টোফার রেগে ওঠতো, বলতো আমি কি 'এ্যান'কে অস্বীকার করেছি? ওর ব্যাপ্‌টিজম্ এর সময় 'উইলিয়াম' লেখা হয়েছে ওর নামের সঙ্গে। আর কি দরকার?' ক্রিস্টোফার ওর মাকে খুব ভালবাসতো। ওর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল মা ওকে ডাকবেন এবং মায়ের শুভেচ্ছা নিয়েই ও আমাকে বিয়ে করবে। তাই বিবেকের দংশনে ক্ষত বিক্ষত হলেও বিয়ের কথা বলে ওকে আঘাত দিতে পারিনি। দিদি, আজকের আমেরিকা আর তিরিশ বছর আগের আমেরিকা এক নয়। তুই তো ফিরে গিয়ে ঝুড়ি ঝুড়ি প্রশংসা করে

বই লিখবি। কিন্তু জেনে রাখিস যতো ভদ্র ব্যবহারই এরা করুক না কেন, কালাকে ওরা সহ্য করে না। রক্ষণশীলতার নির্মমতা আমরা দু'জনেই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি। মেক্সিকোতে তো তোমরা অনেক বড় বড় বক্তৃতা করে এলে। কুমারী মেয়ের মাতৃত্বও আজ কাগজে কলমে স্বীকৃত। কিন্তু তাদের জীবনের ঝড় ঝঞ্ঝার আঘাতের কথা কি তোমরা জানো! তোমার বালীর সর্বাঙ্গে সেই কাঁটার আঘাত। এরা সমাজের ধার ধারে না, মরতে হ'লে নিজের ঘরেই মরে পড়ে থাকে। কিন্তু যে সমাজ চায়, তার অনেক জ্বালা, অনেক যন্ত্রণা। আমি ভারত থেকে এসেছিলাম, হয়ত-বা অনেক নীচুর তলা থেকে। তবুও চেয়েছিলাম সমাজ-স্বীকৃত একটি ছোট পবিত্র ঘর। ঘর হ'ল। কিন্তু কোথায় যেন একটা কাঁটা বিঁধে রইলো। তারপর একদিন ক্রিস্টোফারের আদর সোহাগ আর এনার মা ডাকে কোথায় মিলিয়ে গেল। আমি সুখের সাগরে ভাসলাম দিদি, সত্যিই সুখের সাগর। কখনও অতি দূরের আবছা অস্পষ্ট মায়ের মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠতো। পরক্ষণেই শত কাজের মাঝে মিলিয়ে যেতো সে-মুখ।'

ঘড়িটা টিক টিক শব্দ করছে, বালী চমকে উঠে পড়লো, 'নাঃ, তোমার দেরী হয়ে যাবে' ও রান্না করতে ঢুকলো আর আমি ঢুকলাম ওর রাতের বাগানে। শরীর জুড়িয়ে গেল। নানা রকমের ফুল---ফুলের মেলা। নিঃসঙ্গ জীবনে এতোফুল ফুটিয়েছে বালী। বেচারা স্বামী আর মেয়ে মারা গেল? কি করে জিজ্ঞেস করি ওকে। নিজের কথা ভাবতে শিউরে উঠলাম। আল্লাহ যেনো এ অবস্থা আর কোনও মেয়ের না করেন। সব ফেলে একজনকে সম্বল করে স্রোতে ভাসা সহজ, কিন্তু সেই হাতের কুটোগাছা যদি কখনও সরে যায়, হারিয়ে যায়, তাহ'লে? আগে তো একথা কখনও ভাবিনি। কি ভয়ঙ্কর পরিণতি। বালী শক্ত আছে। আমি হ'লে কি করতাম জানি না। 'মাগো' অলক্ষ্যে মুখ দিয়ে কষ্টসূচক শব্দটা বেরিয়ে এলো।

সামনে রাস্তা দিয়ে বড় বড় রাক্ষসের চোখের দ্যুতি নিয়ে ঝড়ের বেগে গাড়ী চলে যাচ্ছে। এরা আস্তে কিছুই করতে চায় না, পারেও না। কতো অল্প সময়ে জীবনটাকে শুষে নিতে পারে সেই চিন্তা এদের। আশ্চর্য। আমার বয়সী কারও মুখে মৃত্যুর কথা শুনিনি।

উপরন্তু নতুন করে ঘর গোছাতে দেখেছি। কি আসক্তি জীবনের ওপর। আর আমার তো এখন মনে হয় চারিদিকে শুধু বোঝা। কেন এমন মনে হয়? এ কি জন্ম জন্মান্তরের সংস্কার? জীবন-বিমুখতা আমাদের জীবনদর্শনেই আছে। পাঁকাল মাছের মত পাঁকে থাকো, কিন্তু গায়ে পাঁক লাগিও না। জলে নামো তবে বেশী ভেজাবে না।

বালী বেরিয়ে এলো। খেতে ডাকছে। ছোট্ট খাবার টেবিলটা সুন্দর করে সাজিয়েছে। ভাত, স্যালাদ আর চিংড়ীমাছের মালাইকারী। নানা হাসি তামাশার কথা বলতে বলতে দু'জনে খেতে লাগলাম। বালী বল্লে, 'দিদি, বলতো কাঠির চেয়ে ভাল রেঁধেছি কিনা?' কাঠি ছিল আমাদের কমবাইণ্ড হ্যাণ্ড। সেও ছিল বেশ ভাল পরিমাণে বোকা। একবার দেখি সকালে খোঁড়াচ্ছে। ব'ল্লাম, 'কি হয়েছে?' 'পুড়ে গেছে', উত্তর এলো। 'কেমন করে পুড়লো?' 'উনুনে', উনুনে পা পোড়ে কি করে? রাতে শীতের জন্যে সে উনুনের কাছে শুতো। কাঠের উনুন কখন ঘুমের ঘোরে পা ঢুকিয়ে দিয়েছে। আশ্চর্য। লোকটার বোধশক্তি নেই নাকি? পা পুড়ে যাওয়া পর্যন্ত কেউ আগুনে পা রাখে।

হঠাৎ ভীষণ হাঁসি পেলো, ফলে বিষম খেলাম। বালীও হেসে উঠলো, 'তুই বড় নিষ্ঠুর ছিলি দিদি, তোর জন্যে কাঠির বিয়ে হ'ল না।' ব'ল্লাম 'তুই করলেই পারতি, অমন বর পাওয়া যাবে না। কান ধরে ওঠ বোস করাতে পারতি। নিজে খেতে পায় না, তার আবার বিয়ে করার সখ।' 'তাতে কি ও মানুষ না।' প্রতিবাদ করে উঠলো বালী। একটা দিনের জন্যে তোরা ওকে হাটে যেতে দিসনি। আমার কাছে কতো দুঃখ করতো।' সত্যি আজব রীতি নীতি। কোলদের ভেতর একটা প্রচলিত প্রথা ছিল। যদি হাটে কোনও যুবতী কোনও যুবকের ধুতি ধরে টান দেয় আর ঐ যুবক অবিবাহিত থাকে তাহ'লে তাকে বউ করে ঘরে আনতে হবে। যাতে ওই রকম কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে সেজন্যে আমাদের কড়া নজর ছিল কাঠি যেনো বাজারে যেতে না পারে।

'সম্ভবতঃ এখন কাঠি সুখে সংসার করছে।' মন্তব্য করলাম। 'ছাই করছে, যখন বয়স ছিল তখন তোরা বাধা

দিয়েছিস, এখন তো বেচারা বুড়ো হয়ে গেছে।' সখেদে উক্তি করলো বালী। ব'ল্লাম, 'তোর মাছ রান্না অপূর্ব হয়েছে বালী। শিখলি কোথায় ?' 'কলকাতায় মামীর কাছে। মামী আমাকে অনেক রান্না শিখিয়েছিল। এই চিংড়ীকারী খুব ভালবাসতো ক্রিস্টোফার। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো বুক চিরে। ক্রিস্টোফারের কথা জিজ্ঞেস করতে সাহস হ'চ্ছিল না। যদি কেঁদে ওঠে, যদি এপরিবেশ-টুকু নষ্ট হয়ে যায়। বাটি ভর্তি আইসক্রীম খেয়ে উঠে আবার সেটিতে গিয়ে বসলাম। কফি এলো। বালী একটা সিগারেট ধরিয়ে এক মুখ ধোয়া ছাড়লো।

'বাকিটা আজ আর না দিদি। কাল বলবো। এই সুখের অনুভূতিটুকু নষ্ট করতে মন চাইছে না।' বালী থেমে গেল। আমার ঔৎসুক্য তখন ডিটেকটিভ্ বই-এর ছেঁড়া শেষ পৃষ্ঠা পাবার মত। কি হ'ল ক্রিস্টোফারের, কি হ'ল ওর মেয়ে এনার ? কিন্তু না ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বালী আবার শুরু করল, 'এর পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত দিদি, আমার কপাল ভাঙ্গলো। ক্রিস্টোফারের এক কাজিন, নাম জুডি তার বয় ফ্রেণ্ডকে নিয়ে বেড়াতে এলো হাওয়াই। ক্রিস্টোফারের মতই উচ্ছল চঞ্চল হাসিখুশী। চার পাঁচ দিনে আমার বাড়িটাকে গরম করে তুললো। আবার আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ওরা চলে গেল। কয়েকদিন পর একটা ভাল কাজের খবর দিয়ে চিঠি লিখলো জুডিথ্। ক্রিস্টোফার ওয়াশিংটন গেল। আমি কিছুতেই ওকে যেতে দিতে চাইনি। কিন্তু ওর কথাগুলোও উড়িয়ে দিতে পার-লাম না। ক্রিস্টোফার বললো, এনা বড় হচ্ছে। ওর লেখাপড়া আছে, ওকে প্রতিষ্ঠিত করবার দায়িত্ব আছে আমাদের। এখানে লেবারের কাজ নিয়ে পড়ে থাকলে চলবে না। সুযোগ যখন এসেছে দেখিই না ভাগ্য পরীক্ষা করে। ভাগ্য পরীক্ষা করতেই ক্রিস্টোফার গেল। ছ'দিনের কথা বলে গিয়েছিল এলো এগারো দিন পর। খুব খুশী মনে ফিরে এলো। মা জোর করে ওকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে-ছিলেন। সেখানেই ও ছিল। বাবার সঙ্গেও কথাবার্তা হয়েছে। ওরা এনাকে দেখতে খুবই আগ্রহী। আমার মনটাও খুশীতে ভরে উঠলো। যাক এতোদিন আমি না পেলেও ও ওর বাবা মাকে ফিরে পেয়েছে। সেও তো কম কথা নয়।

দু' সপ্তাহের ভেতর এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার এলো। ক্রিস্টোফার দ্রুত সব গুছিয়ে নিলো। কিন্তু আমি? আমরা? ক্রিটোফার বললো, ওখানে কাজে যোগ দিয়ে মার কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে তবে আমাদের নিয়ে যাবে। ওয়াশিংটন থেকে ভাড়া তো কম নয়। দু'দিন পর এয়ার লাইন জানালো ওর টিকেট এসেছে অর্থাৎ ওর মা টিকেট পাঠিয়েছেন। এবারে আমি বায়না ধরলাম তাহ'লে তোমার জন্যে যে টাকাটা রেখেছিলে ওটা দিয়েই আমাকে নিয়ে চলো। আপাতত তোমাদের বাড়িতে থাকবো তারপর আমরা ঘর খুঁজে চলে যাবো। প্রথম আব্দার, তারপর মিনতি, শেষে কান্নাকাটি। ক্রিস্টোফার আমাদের রেখেই চলে গেল। যে আমাকে ভারতবর্ষ থেকে হাওয়াই এনেছিল সে আজ আমাকে ওয়াশিংটন নিতে পারলো-না। মাস দুই টাকা পয়সা পেলাম। কতো চিঠি যে লিখেছি তার শেষ নেই। একেক দিন ভেবেছি এনাকে নিয়ে চলে যাই। এনাতো ওদেরই সন্তান। পর মুহূর্তে বুকটা কেঁপে উঠেছে। আমরা তো বিবাহিত নই। এমনি করে তিন মাস পার হবার পর উঠে দাঁড়ালাম শক্ত হয়ে। কাজও পেলাম একটা হোটেলে রিসেপশনিস্ট কাম টাইপিস্টের। বেতন দু'জনের কোনও মতে চলে যাবার মতো। বুঝ-লাম আমার কপাল ভেঙ্গেছে। ক্রিস্টোফার আর আসবে না। মনের গহনে হাতড়ে বেড়ালাম আমার অপরাধের জন্য। না, কোনও সদুত্তর নেই সেখানে। এক বছর পর সব চিঠির উত্তর এক সঙ্গে এলো: আমাকে বিরক্ত করো না আমি এখন বিবাহিত। জুডিথ্ আমার স্ত্রী। এনার জন্যে মাসে কতো করে দিলে তুমি আমাকে অব্যাহতি দেবে জানিও—পরের অংশটুকু তোকে বলতে পারবো না দিদি। আমার অতীত জীবন, জন্ম কোনও কিছুই সে উল্লেখ করতে ভোলেনি।

আগেই বলেছি আমি ঠিক অকূলে ভাসিনি। এতোদিনে এ দেশের ভাষা আচার আচরণ সবই আমার রপ্ত হয়ে গেছে। এন্টালীর মামীর হাতে আমার যে পিয়ানোর হাতেখড়ি হয়েছিল ক্রিস্টোফারের উৎসাহে তাতে হাত অনেক পেকেছে। গানও ভলোই গাইতে পারি। ওই পিয়ানোটা আমার শেষ মিলন বার্ষিকীর উপহার।

তাকিয়ে দেখলাম, তার উপর একটি যুগল ফটো তার আর ক্রিস্টোফারের। আর পাশের টেবিলে বিভিন্ন বয়সের একটি অপূর্ব সুন্দরী মেয়ের ভিন্ন বয়সের সব ছবি। বুঝলাম এনা। বালী বলেই চলেছে, 'এসব ধনের সঙ্গে আমার বাড়তি মূলধন ছিল হাওয়াইয়ান রূপ-চুলের বাহার আর ভর যৌবন। তুই তো জানিস কোল মেয়েরা পঞ্চাশেও যৌবনবতী থাকে। বেশ বুঝলাম এখনও পুরুষের চোখে আমি লোভের আগুন জ্বালাতে পারি। নিজের একটা সুপ্ত, বিস্মৃত অতীতও ছিল। সেটাও একেবারে উড়িয়ে দেবার মতো নয়। হোটেলের চাকরির সঙ্গে বিদেশী পর্যটকদের আতিথ্য দেওয়া হ'ল আমার নতুন পেশা। জানি সব শুনে তুই আমাকে ঘৃণা করবি। করতে পারিস, আমি তাতে কিছু মনে করবো না তবে মিথ্যে কথা আমি অন্তত তোর কাছে বলবো না। এনার লেখাপড়ার সুযোগ হ'ল। ও একান্তই বুদ্ধিমতী ও তীক্ষ্ণধী। লেখাপড়ার আগ্রহও ওর প্রচণ্ড। ওর বছর দশেক বয়সের ভেতর আমি এ বাড়িটুকু বানিয়েছি আর ওকে মানুষ করবার মতো অর্থও সংগ্রহ করেছি। এনা ওর বাপের কথা জানতে চাইলে আমি এক বর্ণও ওর কাছে গোপন করলাম না।

কখন যেনো ও 'এ' লেভেল পাস করে ইস্ট ওয়েস্ট সেন্টারে পড়তে গেল। মেয়ের রূপ আমাকে ভীত, সন্ত্রস্ত করে তুলতো। বাপের মত গায়ের রঙ আর আমার মতো চোখ ও চুল। ও খুব গর্ব করে সবাইকে বলতো আমার মা ভারতীয়, তাই আমি এতো সুন্দরী। নিজের মেয়ে বলে নয়। আমি মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ওর চলার পথের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। বলতো মামী, কিছুদিন অপেক্ষা কর। আমি পড়াশুনা শেষ করে টিচার হবো। তখন মা মেয়েতে একসঙ্গে সুখে জীবন কাটাবো। হেসে বলতাম, তা কি হয়? তুই বিয়ে করবি তোর ছেলে মেয়ে হবে। তোর সে-সুখের সংসারে আমি যাবো কেন? আমি এখানেই থাকবো। ওর দু'চোখে আগুন জ্বলে উঠতো। বিয়ে? এখানে? এই আমেরিকানদের সঙ্গে? আমি ওদের ঘেন্না করি, মামী, ঘেন্না করি। ভীত হ'তাম ওর কথায়। মাঝে মাঝে বলতো, মা, আমাকে আরেকটু কালো করলে না কেন—তা হ'লে নিজেকে আমেরিকান বলতে হতো না। এর ভেতর হঠাৎ একটা চমকপ্রদ ঘটনা ঘটলো।

আমি রাত প্রায় ২'টার দিকে ডিউটি থেকে ফিরে এসেছি। দেখলাম এনা খুব উত্তেজিত। আমাকে দেখেই ফেটে পড়লো, জানো ওই রাস্কেলটা এসেছিল। অবাক হয়ে বল্লাম, কে? বললো, তোমার ক্রিস্টোফার। থর থর করে শরীরটা কেঁপে উঠলো, তারপর? তারপর? ঘেন্নায় এনার নাক কুঁচকে ওপরে উঠলো, 'এসেছিলো আমাকে দয়া দেখাতে। ওর বিয়ে ভেঙ্গে গেছে। কোনও ছেলে-মেয়ে নেই। আমাকে নিয়ে যেতে চান। ওর কাছে থাকলে আমার ভাল কেরিয়ার হবে। অনেক লেখাপড়া শিখতে পারবো..... ওকে কথা শেষ করতে দিলাম না, বল্লাম, ভালই তো, বাপের কাছে থাকতে না পারাটা তো...। 'চিৎকার করে উঠলো এনা, থাম তুমি। বাপ। ওটা একটা পশু। তোমার সম্পর্কে কি সব বিশ্রী কথা বলতে শুরু করেছিল। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গিয়েছিল। ড্রিংস্ চেয়েছিল, দেখলাম হাত কাঁপছে অর্থাৎ এ্যালকোহলিক হয়ে গেছে। বড় ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম দিয়েছে। অনেক টাকা। গেলে আমিই সব পাবো ইত্যাদি।..... শেষ পর্যন্ত আমি ওকে বের করে দিয়েছি।

দু'হাতে মাথা চেপে বসে পড়লাম। একি করলো মেয়ে। আমি যে আজও তার পায়ের শব্দ শুনবার জন্য কান পেতে আছি। গলা আমার শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। শুধু কষ্টে উচ্চারণ করলাম। তাড়িয়ে দিলি? হ্যাঁ, তাড়িয়েই দিলাম। তুমি ইণ্ডিয়ান তাই ওকে ভয় পাও। সমীহ কর। আমি আমেরিকান ওর মুখোমুখী হবার অধিকার আর ক্ষমতা দুটোই ধরি।' বিশ্বাস করবি না দিদি সারাটা রাত ঘুমুতে পারলাম না। মনে হ'চ্ছিল দরজায় এই এক্ষুণি সেই পরিচিত টোকা পড়লো। দু' একবার উঠেও বসলাম। কিন্তু না, কেউ এলোনা।'

এনার কথার সূত্রে একটা কাহিনী মনে পড়লো। দু'বোনের বড়বিল থেকে আসার শেষ দিনটা। টাটাতে আমাদের ট্রেন বদলাতে হতো। ওখানে একটা প্রথম শ্রেণীর বগী থাকতো। সেটাকে ইঞ্জিন ট্রেন এসে তার সঙ্গে জুড়ে দিতো। আমরা আগেই গিয়ে রিজার্ভ বার্থে শুয়ে পড়তাম, তারপর কখন ট্রেন আসতো টেরও পেতাম না অনেক সময়। ভোর বেলা হাওড়া গিয়ে পৌঁছাতাম। এবারে কিন্তু নিদ্রাভঙ্গ হলো। গার্ড এসে জানালো, 'আপনাদের সবার

রিজার্ভেশন বাতিল। এখানে মিলিটারী অফিসাররা যাবেন।' আমরা স্তম্ভিত ও ভীত বল্লাম, 'মধ্যপথে আমরা দু'জন মহিলা যাবো কোথায় ?' গার্ডের উত্তর সংক্ষিপ্ত 'জানিনা।' শমন জারি করে তিনি গট্‌গট্‌ করে চলে গেলেন। তখন বড় বড় স্টেশনে পুলিশের সঙ্গে একজন আর্মি অফিসারও থাকতো। গিয়ে তাকে পেলাম এবং সব বুঝিয়ে ব'ল্লাম। 'রিজার্ভেশন প্রয়োজনে বাতিল হয়েছে ঠিক আছে, তবে আমাদের একটা ছোট কুপেতে ফিমেল কম্পার্টমেন্ট এটে জায়গা করে দাও।' লোকটা খাঁটি ইংরেজ। নারীর মর্যাদা রাখলো। ট্রেন আসতেই আমাদের একটা ছোট ক্যুপেতে 'জেনানা' কাগজ ঝুলিয়ে তুলে দিল। ধন্যবাদ দিয়ে লম্বা হবার ব্যবস্থা করছি দেখি ওই এ্যাংলো গার্ড এক অর্ধবয়সী স্বজাতীয়াকে নিয়ে এসেছে। বল্লে, 'দয়া করে ওকে উঠতে দাও। ওকে স্থান দিতে হবে না ও ফ্লোরেই যাবে।' মুখ গোমড়া করে হ'লেও ওকে ঢুকতে দিলাম। ভাবলাম দিনকাল ভাল না, একজন মেম সাহেব সঙ্গে রইলো, সুবিধা হবে। অন্তত কেউ এলে ইংরেজীতে কথা বলতে পারবে। আমার তো ব্যাকরণ ঠিক করতে করতে যা ঘটবার ঘটে যাবে।

দরজা, জানালা ভাল করে বন্ধ করে ল্যাচ্‌ কী লাগিয়ে দিলাম। এতোক্ষণে মেমসাহেবের কথা ফুটেছে। কি ব্যাপার, এতো ধমকাচ্ছে কেন ? ওপর বার্থ থেকে আমার তালপাতার সেপাইবোন বাংলায় বললো 'বুঝতে পারবে চালকুমড়ো, খড়গপুর আর খুরা রোড এলে।' তড়িতে জবাব এলো 'হোয়াট।' ব'ল্লাম কিছু না শুয়ে পড়। দিন না হ'লে কোনও স্টেশনে দরজা খুলোনা'। মেম সাহেব ঠোঁট বাঁকা করে 'ফুঃ'-এর ভঙ্গী করলো। বসতে পেরেছে, এবারে শুতে চায়। প্রস্তাব দিলো 'এসোনা এক জোড়া জুতোর মতো বিপরীতে মাথা দিয়ে আমরা একই বার্থে শুই।' ততোক্ষণে মেম সাহেবের গলদা চিংড়ীর আকারের বতুলাকার চরণ যুগলের উর্ধাংশ আমার দেখা হয়ে গেছে। বিনীত ভাবে ব'ল্লাম, 'দ্যাখো, ঘুমের ভেতর যদি আমার লাথি তোমার নাকে পড়ে তাহলে কি অবস্থা হবে বলো। তারচেয়ে নিচেই শুই আমি তুমি ওপরে থাকো।' রাজার জাত তাতে খুবই খুশী হ'ল। এবারের মতো আমার খাঁদা নাকটা বেঁচে গেল।

মাঝ রাতে ঘুম ভেঙ্গে গেল। দরজার ওপর ধুপধাপ লাথি ; অশ্রাব্য মুখ খিস্তি। মেমসাহেব জাতভাইয়ের গলা পেয়ে ওঠে বসেছে—'খুলবো নাকি দরজাটা একবার'? আমার বোন ওপর থেকে জবাব দিলো। বেশ করে ভেবে চিন্তে দরজা খুলো মেমসাহেব। আমাদের তো কোনও ভয় নেই, আমরা কালো। ওরা তো তোমাকেই আগে ধরবে, কারণ তুমি ওদের স্বজাতি।' ভয়ে পড়ন্ত যুবতী এ্যাংলো আম্‌সী হয়ে গেল। হঠাৎ বালিশটা নিয়ে মেঝেয় আমার পাশে এসে ধপাস করে শুয়ে পড়লো। হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, 'না, না খুলবো না। আর আমি নীচে শুলে ওরা কোনও রকমেই নেট অথবা কাচের ফাঁক দিয়ে আমাকে দেখতে পাবে না।' আমি মাঝ রাতে ওপরের গদীতে স্থানান্তরিত হ'লাম। এ নিয়ে আজও দু'বোনে মনে পড়লে হাসাহাসি করি। যুদ্ধের সময় হোটেলে বসে হিসাব করতাম ইংরেজ হেরে গেলে মিস রবিকে দিয়ে কাপড় কাচাবো, মিস্ স্টুয়ার্টকে দিয়ে বাসন মাজাবো ইত্যাদি। বলা বাহুল্য দু'জনেই ছিলেন আমাদের শ্বেতাঙ্গিনী ওয়ার্ডেন। কতো গুপ্ত বাসনাই না ছিল। ভারত স্বাধীন হ'ল ; ওরা দেশ ছাড়লো। কিন্তু বিদায় অভি-নন্দন নিয়ে। কিছুই করতে পারলাম না। এনা ঠিকই বলেছে, ওতো ভারতীয় নয় ; বৈষ্ণব-বিনয় ওর জন্য নয়। তাই বাপের সঙ্গেও তার 'শঠে শাঠ্য' সম্পর্ক হতে বাধা নেই।

বালীর সব কথার ভেতর দিয়ে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে ও এখনও ক্রিস্টোফারকে ভালবাসে, আজ এসে ডাকলেই ও দৌড়ে যাবে। হায়রে মোহান্ধ রমণী হায়রে তোর অন্ধ প্রেম। ক্রিস্টোফার তোকে পাষাণ করে গেছে। হয়ত-বা তোর জীবনেও অনেক পুরুষ এসেছে। কিন্তু রামচন্দ্রতো আর এলো না। তুই আজও কাঁদছিস। তোর মুক্তি মিললো না। এবারে গুছিয়ে নিয়ে ব'ল্লাম, 'তারপর তোর এনা কোথায়? হোটেলে? আমাকে দেখাবি না?' 'সে আরেক কাহিনী দিদি তোকে কাল বলবো।' 'কাল? কখন?' 'কেন তোর যখন সময় হবে। তুই-ই বল কখন তোকে নিয়ে আসবো।'

কফি হাতে ভাবছি আগামী কালের কর্মসূচীর কথা। না বিকেলে ফ্রি আছি। 'আজ যেমন সময় গিয়েছিলি ওই সময়েই যাস'।' 'আমার কথায় বালী খুব খুশী হ'ল। হঠাৎ দরজায় এসে টোকা পড়ল।

বালী সতর্কতার সঙ্গে 'আই' দিয়ে দেখে দরজা সামান্য ফাঁক করে কি যেন বললো। লোকটা সম্ভবত চলে গেল। ঔৎসুক্য না দেখালেও বালী বললো, 'বাড়ি খুঁজছে।' ওটুকু বলবার দরকার ছিল না। মনে হ'ল কোনও রাতের অতিথিকে বিদায় দিল। চঞ্চলা বালী আজ একটা দিনের জন্যে ওর কৈশোরে ফিরে গেছে। আমার কাছে সে ছোট বালী আবার যেন ছোট হয়েই এসেছে। কতো কথা, কতো হাসি, কতো চোখের জল।

এবারে দরজায় পরিচিত টোকা। বল্লাম, 'এ্যান।' বালী দরজা খুলে ওকে ভেতরে ডাকলো। এ্যান সঙ্কোচের সঙ্গে বললো, 'প্রফেসর আমি দুঃখিত, এখন রাত সাড়ে এগারোটা, এবারে তোমার ফেরা দরকার।' বালী ওকে কফি দিলো, এ্যান শান্ত হয়ে বসলো। বালী জিজ্ঞেস করলো আইসক্রীম খাবে কিনা? সানন্দে এ্যান ঘাড় নাড়লো। পরিতৃপ্ত হয়ে বললো, 'মনে হয় তোমরা পুরনো বন্ধু।' 'ঠিক ধরেছো তুমি', দ্রুত উত্তর দিলাম। 'আচ্ছা প্রফেসর, তোমার কতো বন্ধু আছে বলতে পারো? ওঃ অনেক তাই না?' 'আমার মুখের উত্তর বালী কেড়ে নিলো, ইচ্ছে করলে তুমি আমার বন্ধু হতে পার।' এ্যান একটু থেমে বললো, 'পত্রে হতে পারি, এমনিতে সম্ভাবনা কম। কারণ আমার হাওয়াই আসা এই প্রথম। সম্ভবত এই শেষ। কফির শূন্য পেয়ালা রেখে উঠে দাঁড়ালাম। বালী দ্রুত গাড়ীর চাবি হাতে নিয়ে বললো, 'চলো তোমাদের পৌঁছে দিয়ে আসি।' এ্যান বার বার নিষেধ করলো। ততোক্ষণে বালী গাড়ীর দরজা খুলে দাঁড়িয়েছে। নিঃশব্দে ওর পাশের সীটে বসলাম। দু'চার মিনিটেই হোটেলে পৌঁছে গেলাম। কাল বিকেলে পাঁচটায় বালী আসবে জানিয়ে দিল। হেসে হাত নেড়ে লিফ্‌টের সামনে গিয়ে দেখলাম বালী তখনও হাত নাড়ছে। গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস বুক ভেদ করে বেরিয়ে এলো। এ্যান বললো 'শরীর খারাপ লাগছে।' 'না, না' ব্যস্তভাবে উত্তর দিলাম, 'আমি খুবই ভাল এবং সুস্থ আছি।' শুভরাত্রি জানিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে ধপ্ করে বিছানায় বসে পড়লাম।

কাল সকাল দশটায় শিক্ষা বিভাগের এক কর্মকর্ত্রীর সঙ্গে আমার প্রোগ্রাম আছে। তারপর একজন সলিসিটার ও একজন সমাজ কর্মীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে। এঁরা সবাই নারী মুক্তির নেত্রী,

নারী পুরুষের সঙ্গে সম অধিকারে বিশ্বাসী। মেক্সিকো সম্মেলনের পর নারী প্রগতির এসব প্রথিতযশা মহিলার সঙ্গে আমার মাধ্যমে দু'দেশের ভাব বিনিময় হবে। পরস্পরের সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হবো সেটাই ছিল এসব দেখা সাক্ষাৎ আর আলাপচারিতার মুখ্য উদ্দেশ্য। আজ এই নারী দশকের নবম বর্ষে এসে ভাবছি ১৯৭৫ সালে মেক্সিকো কনফারেন্সের পর মধ্য দশক হ'ল কোপেনহেগেনে। কতো বক্তৃতা হ'ল ; আলাপ আলোচনা সিদ্ধান্ত। পতিতার অধিকার, সমকামীর অধিকার পর্যন্ত জ্বালাময়ী ভাষায় প্রচারিত হ'ল। টন টন কাগজ টাইপ হয়েছে, ছাপা হয়েছে, বিলি হয়েছে। বড় বড় হোটেলের হয়েছে প্রচুর অর্থ সমাগম। কিন্তু আমার দেশের জরিনা আর হাওয়াই দ্বীপের বালীর সমস্যা তো একই রয়ে গেছে। আজ এতো বছর পরও বালী কেন দেশে ফিরবার কথা ভাবতে পারেনা। ক্রিস্টোফার কেমন করে নেচে নেচে বিয়ে করে চলেছে একটার পর একটা। কারণ প্রথাগত সমাজ ব্যবস্থা। জানিনা আগামী একশ বছরেও এর বুনিয়াদ নড়ানো যাবে কিনা।

বালী দেশে যাবেনা কারণ তার সমাজ তাকে গ্রহণ করবে না। যে সমাজ তাকে খেতে পরতে দিতে পারেনি, যে সমাজ তাকে পাঁকের বুকে ছুঁড়ে দিয়েছে, সেই সমাজ আজ বিচারকের আসনে। বাহবা দিতে ইচ্ছে হয় সমাজপতিদের। বালী বলেছে দেশে ফিরে যদি স্বজনের মাঝেই না থাকতে পারি তাহ'লে এন্টালী আর হনুলুলুতে পার্থক্য কোথায় ? বরং এখানেই ভাল, কেউ আমাকে নিয়ে মাথা ঘামাবে না। না করবে 'আহা উহু' না করবে 'দূর ছাই'। অন্তত আঙ্গুল উঁচিয়ে বলবে না, ওই যে বড়বিলের মেয়ে বালী যে একদিন পতিতাবৃত্তির জন্য ঘর ছেড়ে চলে এসেছিল ভিন দেশীর হাত ধরে। আশ্চর্য ১৯৭২ সালে ঠিক একই জবাব দিয়েছিল পাকিস্তানী বন্দীশিবিরে বিবাহিতা পরিচয়দানকারী মেয়েরা। একটি ষোল সতেরো বছর বয়সের রাজশাহীর মেয়ে আমাকে বলেছিল, 'কেন থাকতে বলছেন ? রাখবেন আপনার বাড়িতে ? আমরা পাকিস্তানী সিপাই ক্যাম্পে থাকা মেয়ে। আমাদের কেউ-ই ঘরে নেবে না। পরিণাম পতিতা-বৃত্তি। তাই যদি হয় তাহ'লে ওকাজটা বিদেশে অপরিচিতের মাঝেই করা ভাল। কেউ জানবেনা, চিনবে না, টিটকারী দেবে না বাপ

ভাইয়ের পরিচয় তুলে।' আজ তারা কোথায় জানিনা। তবে তাদের চোখে যে ক্ষোভ ও জ্বালার আগুন দেখেছিলাম, তা কখনও ভুলতে পারবো না। সমাজ তাদের রক্ষা করতে পারেনি কিন্তু কতো অনায়াসে বিচারকের আসনে বসতে পেরেছিল।

কোথায় আমাদের সামাজিক অবস্থান? পৃথিবীর বুকে লক্ষ, কোটি পতিতা আজও দেহকে পণ্যসামগ্রী করে অন্নসংস্থান করছে, তাওতো জুটছেনা কপালে। সেখানেও সিংহ ভাগ যাচ্ছে বাড়িওয়ালী-রূপী দালালের পেটে। অবশ্য আমাদের ন্যায়-নীতির মানদণ্ডের কাঁটাটাকে স্বার্থভিত্তিক অবস্থানে রেখে চলেছি। পতিতালয়ে না গিয়েও উচ্চতর সমাজ জীবনে অবাধ পতিতাবৃত্তি চলছে। শুধু বালীর মতো দরিদ্র মেয়েরাই সমাজ-ভীরু আর তাই মদগর্বী সমাজের চোখে তারা পতিতা। এই ধনতান্ত্রিক সভ্যতায় মানুষের মূল্যবোধের মাপকাঠি নতুন করে কবে আবিষ্কৃত হবে জানিনা। এখানেও হয়ত অদূর ভবিষ্যতে কম্পিউটার ব্যবহৃত হতে পারে।

অনেক রাত পর্যন্ত বিছানায় ছটফট করলাম। ঘুম আসতে চায় না। চোখ বুঁজলেই বড়বিল, বালী, বালীর মা এদের দেখতে পাচ্ছি। আধো ঘুম বা তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থাতেই বলতে গেলে রাতটা কেটে গেল।

পরদিন সকাল থেকে খুবই ব্যস্ত রইলাম। দুপুরে একটা কফি শপে আমি আর এ্যান খাওয়া সেরে আড়াইটায় একজনের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। মহিলা ইহুদী, খ্রীস্টান বিয়ে করেছেন। সুতরাং স্বসমাজ বহিষ্কৃতা। বাপ মা মুখ দেখেন না। কোনও যোগাযোগ নেই। কি আশ্চর্য! সাদা চামড়া হলেও রেহাই নেই, কি গোলক-ধাঁধাতেই আছে মেয়েরা। শুধু পাকই খাচ্ছে প্রতিনিয়ত। হোটেলে ফিরতে প্রায় চারটা বাজলো।

উদ্বিগ্ন মুখে লাউঞ্জে বসে আছে বালী। পরণে নীল রঙের টাইট জীনস্, ওপরে হাল্কা গোলাপী রঙের একটা ঢিলাঢালা ব্লাউজ। লম্বা সোজা চুল খোলা, এক পাশে কানের ওপর একটা গোলাপী গোলাপ গোঁজা। দেখলে হাওয়াইয়ান ছাড়া ওকে আর কিছু ভাবা যায়না। এক মনে একটা ম্যাগাজিনের পৃষ্ঠা উল্টে যাচ্ছে। তাতেই বুঝলাম ওর মনের অস্থিরতার কথা। আমি অপলকে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

ওর আজকের সযত্ন প্রসাধন-চর্চিত বেশভূষায় ও যেন কুড়িটা বছর ওর টাইট জিনসের পকেটে ভরে ফেলেছে।

নিঃশব্দে ওর পেছনে এসে দাঁড়িয়ে ওর কাঁধ ছুঁলাম। চমকে উঠে দাঁড়ালো, এসেছিস ? আমি খুব ভাবছিলাম কিন্তু। রিশেপশান বলতে পারলো না তোরা কোথায় গেছিস। চল্।' ব'ল্লাম, 'মুখ হাত ধোব না ?' 'কেন আমার বাড়ি কি মরুভূমি ? তবে শাড়ী নেই। বদলাতে চাইলে বদলে আয়। আমি বসি'। হেসে হাতের কাগজপত্রগুলো এ্যানের হাতে দিয়ে বল্লাম, 'তোমার ঘরে রেখে দিও। আজ বাকি দিন তোমার ছুটি। প্রাণ ভরে সাঁতার কাটো আর বয় ফ্রেণ্ড খুঁজে আড্ডা মারো। আমি বাধা দেবোনা।' এ্যান খুশী হয়ে হাত বাড়িয়ে কাগজ-পত্রগুলো নিয়ে বললো, 'সাঁতার দিতে না গেলে তোমার বন্ধুকে পেতে কোথায় ?' আচ্ছা তোমাদের আর দেরী করাবো না। সন্ধ্যা উপভোগ কর।' ধন্যবাদ দিয়ে অদূরে পার্ক করা বালীর গাড়ীতে উঠলাম।

বাসায় পেঁছে দরজা খুলে দিয়ে বললো, 'দিদি, রাগ করেছিস ? আমি তোকে বাজপাখীর মতো ছোঁ মেরে নিয়ে এলাম।' হেসে বল্লাম, 'তোর মূল্যবান দিদিটাকে নেবার জন্যে আর কেউ তো অপেক্ষা করে ছিল না। বাকি সময়টুকু আমি তোর সঙ্গেই কাটাবো। আজকের এই রাতটুকু। কাল সকালেই তো সানফ্রান্সিসকো চলে যাবো।' বালীর বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। ঘরে ঢুকেই বল্লাম, 'আমি স্নান করবো রে।' বল্লো, 'যাও, ওই তো বাথ। আচ্ছা একটু দাঁড়াও।' একটা হাউজ কোট ভেতর থেকে এনে দিলো, 'এটা ধোয়া আছে, শাড়ী ছেড়ে ওটা পরে আরাম করে বোস।' আমি বাথরুমে ঢকবার মুখে চেঁচিয়ে বললো, 'গোলাপী টাওয়েল সেটটা তোমার।'

আঃ ঠাণ্ডা জলের ধারায় দেহ মন জুড়িয়ে গেল। কালিদাসের কালে কেমন ধারাযন্ত্রে সুন্দরীরা স্নান করতেন জানিনা, তবে আমাদেরটাও নেহায়েত নীরস নয়। চার পাঁচ দিনের গায়ের ময়লা ধুয়ে বেশ পবিত্র, পরিচ্ছন্ন হয়ে বেরিয়ে এলাম। বালী ততোক্ষণে টেবিল সাজিয়ে ফেলেছে। ব'ল্লাম, 'খুব ক্ষিধে পেয়েছে বালী, কিছু খাবার দে।' ও হেসে ফেললো, 'স্নান যখন করতে গেছ তখন খাবার চাইবেই। নাও খাও কতো খাবে।' টেবিলে দু'তিন রকম স্যাণ্ডউইচ্ কেক ইত্যাদি। কফি ঢেলে আহারে মনোযোগী হ'লাম। এ্যানের

জন্য খারাপ লাগছিলো। মেয়েটা খেতে খুব ভালবাসে। কিন্তু ও থাকলে আমি বালীর সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হ'তাম। হঠাৎ বলে উঠলাম 'আচ্ছা বালী এটা যদি বড়বিল হতো ?' ও উঠে এসে আমার মুখটা চেপে ধরলো। 'ও কথা বলিস না, বড়বিলের বালী নেই, মরে গেছে আর বড়বিল ও বালীকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। আমি এখন হনুলুলুর মিসেস উইলিয়াম। ওই নামেই আমার পরিচয়।' 'ঠিক আছে, তাই ভাল মিসেস উইলিয়াম, এবারে এনার কথা বলুন'।

বালী নিজেকে যেন একটু গুছিয়ে নিলো। ওর আর আমার দু'জনের কাপেই পুরা কফি ঢেলে নিলো। খুব প্রশান্ত ভাবে বললো. 'তোমাকে এনার কথা বলতেই হবে, কারণ তোমার হয়ত ওর সঙ্গে দেখা হবে।' আমি বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। তবে আজ ঠিক করেই এসেছি আমার মুখ বন্ধ রাখবো। আজ আমি নীরব শ্রোতা। ওর যা বলবার আছে বলুক। এ জীবনে অন্তত ওর সঙ্গে আমার আর দেখা হবার সম্ভাবনা নেই। হঠাৎ বলে বসলো, 'দিদি, এই হাওয়াই দ্বীপে তোর সবচেয়ে কি ভাল লেগেছে বলতো ?' হেসে ব'ল্লাম, 'পরীক্ষা নিচ্ছিস ? তা হ'লে শোন ভাল লেগেছে তিনটে জিনিস—সমুদ্র, ফুল আর—।' 'আর কী ?' অধীর আগ্রহ বালীর কণ্ঠস্বরে।' আর 'বালী' বক্তব্য শেষ করলাম। 'যা, তুই খুব দুষ্টু দিদি।'

'মনে মনে এখানকার ফুলের প্রসাধন আর তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রের সঙ্গে একটা যোগসূত্র খুজতে চেষ্টা করেছি। সৌন্দর্য ছাড়া আর কিছু খুঁজে পাইনি—হয়ত-বা দুই-ই সম পবিত্র। 'আচ্ছা এখানকার লোকেরা এতো ফুল পরে কেনরে ?' বালী উত্তর দিল, 'তুই অনেক লেখাপড়া করেছিস, তবুও বলি ফুলের একটা সর্বনাশা নেশা আছে—ওর রূপ ও সৌরভ দুটোরই। এখনাকার লোকেরা ফুল পরে, ট্যুরিস্ট এলে ফুল পরায়। তারপর ভেতর থেকে কামনার সমুদ্র গর্জন শুনতে পায়. যৌবনের উন্মাদনা মানুষকে ভর করে। কতো লোক দেখলাম যারা হাওয়াইয়ের ফুল আর সমুদ্র গর্জনকে এক করে দেখতে পেরেছে।' তাকিয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে সেই বালী উচ্চারণ করছে এতো বড় দার্শনিক তত্ত্বকথা। অশিক্ষিত কোলকুমারী সত্যিই হারিয়ে গেছে। ক্রিস্টোফার একজন সুরুচিসম্পন্না আমেরিকান মহিলাকে তার দেহে প্রতিষ্ঠিত করেছে

বেশ সার্থকভাবেই। হ্যাঁ, স্থপতি বটে ক্রিটোফার। মনে মনে তারিফ না করে পারলাম না। মুখে ব'ল্লাম, 'তুই অনেক লেখাপড়া করেছিস বালী, সত্যিই তুই একজন আত্মসচেতন রমণী।' 'না, না দিদি, আমি কিছুই করতে পারিনি. শুধু বইপত্র পেয়েছি আর গিলেছি। পড়াশুনা করেছে এনা। ও যেমন সুন্দর তেমনি মেধাবী। ইস্ট ওয়েস্ট সেন্টারে ওর প্রফেসাররা ওকে খুবই ভালবাসতেন। দেশ না ছাড়লে ও ওখানেই কাজ পেতো। কিন্তু চলে গেলরে।' আনমনা হ'ল বালী। ওকে একটু সময় দিলাম আত্মস্থ হতে। বল্লাম, 'কোথায় গেল ? মেইনল্যাণ্ডে ? ক্রিটোফারের কাছে ?' 'না, না দিদি, সেখানে ও যায়নি। আমাকে অপমান করেনি। ও ধার শোধ দিয়েছে দিদি। ও যতোই বড় হ'তে লাগলো, আমার কাছ থেকে কাহিনী শুনলো, বাপের আচরণ উপলব্ধি করলো, তাতেই ক্রিটোফার আর এদেশের প্রতি ওর একটা বিজাতীয় ঘৃণা জন্মাতে শুরু করলো। আমি ওকে অনেক বুঝিয়েছি—সে তোর বাবা, জন্মদাতা ; আমাদের ভেতর মনকষাকষি হয়েছে কিন্তু তুই এতে নিজেকে জড়াচ্ছিস কেন ? কিন্তু না, বড় হয়ে একটা কথাই বলতো—ড্যাড, কেন তোমাকে ভারতবর্ষ থেকে আনলো ? কেন তোমার শেকড় উপড়ে ফেলে তোমাকে এমনভাবে পথে ছুঁড়ে ফেলে দিলো, কেন, কেন ? ওকে তো বলতে পারিনা যে তোর বাবা অনেক উদার, অনেক মহৎ ছিল বলে আমাকে এনেছিল। আমার শেকড় তো আমি নিজেই উপড়ে ফেলেছি আগেই। না দিদি, সে লজ্জার কাহিনী আমি সন্তানকে বলতে পারিনি। হয়ত ক্রিটোফার ওকে সে-কথাই বলেছিল যার জন্য ও এতোটা ক্ষিপ্ত হয়ে আছে। কি যে জাতক্রোধ ওর বাবার আর এ দেশীয়দের ওপর, তা তুমি না দেখলে বিশ্বাস করবে না। অথচ চেহারায় আচার ব্যবহারে ওতো পুরো আমেরিকান। এখানে ওর বন্ধু-বান্ধব বেশীর ভাগই ছিল জাপানী, কোরীয়ান প্রভৃতি এশীয়রা। কয়েকজন চীনা ছেলেমেয়ের সঙ্গেও ওর ঘনিষ্ঠতা ছিল। ভেবেছিলাম ও বোধ হয় বিয়ে থা ওই সমাজেই করবে। তারপর স্কুল ছেড়ে যখন ইস্ট ওয়েস্ট সেন্টারে পড়তে গেল তখন তো পোয়াবারো। বাঙ্গালী আর ভারতীয় দেখলেই হ'লো। তারা সবাই ভাল। ওদের কাছ থেকেই তো তোদের দেশের মুক্তিযুদ্ধের কথা শুনেছি।' 'হুঁ

আমাদের যুদ্ধ বিগ্রহ রাখ তো, তারপর এনার কি হ'ল বল ?' আমি অধীর আগ্রহে জিজ্ঞেস করলাম।

এবারে বালী হেসে ফেললো, 'বলছি শোন। একদিন এনা, হ্যাঁ তখন ওরা দু'জনেই পিএইচ. ডি. নিয়ে ব্যস্ত, এসে আমাকে বললো—মা একজন ভারতীয় ছেলেকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করতে চাই। তোমার মত আছে তো ? বল্লাম—আমার লক্ষ্মী সোনা আমার এতো অনুগত। তা কেমন অতিথি, ভাত খাবে না রুটি। এনা গাল ফুলিয়ে বললো—মা ভাতওয়ালারা বড্ড বেশী চালাক। ওদের বড়শীতে গাঁথতে পারলাম না। শেষ পর্যন্ত রুটিকেই কিছুটা ঘায়েল করেছি। তবে ভাত খাওয়া তার অভ্যাস আছে। অনেক দিন খাইয়েছি ওকে। একটু গম্ভীর হয়ে বল্লাম—তুই কি ওর এ্যাপার্টমেন্টে যাস ? মেয়ে লজ্জা মাখা চোখে বললো—যাই মা, তোমার কাছে আমি কখখনো মিথ্যে বলবো না। বাবা বলেছে ঠিকই, কিন্তু তার মেয়ে বলবে না।

পরদিন সন্ধ্যায় এলো ছেলেটি। কুন্দনলাল সিং পাঞ্জাবী হিন্দু। রাজপুত্রের মতো চেহারা, তবে একটু রুক্ষ ধরনের। কিন্তু আচার আচরণে খুব বিনয়ী। ছোটবেলায় মা মারা গেছে। সংসারে সৎ মা ও দুই বোন। বাপ ভারতীয়, সেনাবাহিনীতে ডাক্তার। ছেলে অর্থনীতিতে পড়ছে। ইচ্ছা প্রফেসর হবে। খুব যত্ন করে খাওয়ালাম। যেই বলেছে মা নেই সেই যেন আমার বুকের সবটুকু মধু ওকে দেবার জন্যে অস্থির হয়ে পড়লাম। প্রথম পরিচয়েই আমার ওকে ভাল লেগে গেল। এরপর প্রায়ই আসতো। অনেক রাত পর্যন্ত থাকতো এনার ঘরে। খাওয়া দাওয়া করতো, চলে যেতো। দিন, মাস, বছরও পার হয়ে গেল। একদিন সসাঙ্কোচে বল্লাম—এনা, তোকে ফেলে চলে যাবে নাতো ? হেসে আমার গলা জড়িয়ে ধরে বললো—না মা, সঙ্গে করেই নিয়ে যাবে। আমার সমস্ত দেহ যেন অসাড় হয়ে গেল। অস্ফুটে ব'ল্লাম—তোকে নিয়ে যাবে ? আমি, আমি কি করবো এনা ? পারবি, আমাকে ফেলে চলে যেতে ?—ওমা, তুমি এখনাই কি সুরু করলে ? যখন যাবো তখন দেখা যাবে। আর তোমাকে ফেলে যাবো মানে কি ? এক বছর তুমি গেলে, অন্য বছর আমরা এলাম। এ ভাবেই তো সবাই যাবে মা। ছেলেমেয়ে বড় হলে কি মায়ের কাছে থাকে ? দেখোনা তুমি এদেশের সবাইকে।

হ্যাঁ, অনেক যুক্তিসঙ্গত কথা। সব ছেলেমেয়েই তো চলে যায়। মার কাছে কজন থাকে। আমিও কি থেকেছি? তাছাড়া আমি মাকে যে আঘাত দিয়েছি তার কি একটু প্রতিঘাতও আমি পাবোনা? বিশ্বাস কর দিদি, তার পরদিন থেকেই আমার কেন জানিনা সব কেমন শূন্য মনে হতো। ওদের দু'জনেরই ডিগ্রী হয়ে গেল। কুন্দন একদিন এসে প্রথাগত ভাবে আমার কাছে প্রস্তাব পেশ করলো। বন্ধু-বান্ধব নিমন্ত্রণ করে পরস্পরকে আংটি পরালো। সবই দেখলাম, সবই করলাম। কিন্তু নিজেকে বড়ড দুর্বল আর অসহায় মনে হতো। ভাবলাম যদি ক্রিটোফার থাকতো তাহলে তাকে অবলম্বন করে বাঁচতে পারতাম। কিন্তু এনা চলে গেলে আমি কি বাঁচতে পারবো! সেদিন বুঝিনি দিদি সংসারে সব আঘাতই সওয়া যায়, আর মাও নিশ্চয়ই সইতে পেরেছিল। কুন্দন তার বাবাকে সব লিখেছিল, শুধু আমার ভারতীয় শেকড়টার কথা উল্লেখ করেনি। আমাকে স্পষ্টই বলেছিল, ওসব জানালে তাঁরা জাতগোত্র খুঁজতে বসবেন। তার চেয়ে আমেরিকান বলাই সুবিধা। বিয়ে হলো। সব রকম আনুষ্ঠানিকতাই এ দেশের রীতি অনুযায়ী হল। আমাকে কিছুই করতে হ'লনা। মেয়ে জামাই নিজেরাই সব ব্যবস্থা করলো। এ দেশে তাই করে দিদি।'

চুপ করে রইল বালী। হঠাৎ খিল খিল করে হেসে উঠলো। 'হাত নেড়ে ওদের বিদায় দিয়ে এসে দু'দিন বিছানা থেকে উঠিনি। ঠিক করেছিলাম খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে মরবো। এ জীবন রাখবো না। তা হ'ল না। আবার উঠলাম, রাধলাম, খেলাম, কাজে গেলাম। আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে এলাম আমি। নিয়মিত চিঠিপত্র আসে। জামাই মেয়ে দু'জনেই বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরী করে। গত বছর একটি ছেলে হয়েছে। ওর দাদু নাম রেখেছে সুন্দরলাল। ডঃ সিং লোক ভাল। খুব চিঠি লেখেন আমাকে যাবার অনুরোধ জানিয়ে। আমিও লিখি। কিন্তু জানি ওই পর্যন্তই আমার শেষ পদক্ষেপ।' বালী উঠে গিয়ে একটা এ্যালবাম নিয়ে এলো। সুন্দর শাড়ী পরে কপালে টিপ মাথায় কাপড় দিয়ে এনা দাঁড়ানো কুন্দনের পাশে। খুব সুন্দর মানিয়েছে ওদের। নানাভাবে তোলা ছবি। ওর বাবা, মা, বোনেরা আর তারপর সুন্দরের ফটো। নার্সিং হোম থেকে শুরু করে এক

মাস আগ পর্যন্ত। দীর্ঘশ্বাস ফেললো বালী 'আমি চেয়েছিলাম ওরা এখানে থাক। তাহ'লে আজ তো সুন্দরকে নিয়েই আমার দিন কেটে যেতো, বিকেলে সেজে গুঁজে গিয়ে সীবীচে বসতে হতো না।' আমি কেঁপে উঠলাম। তাহলে কি বালী তার পুরানো পেশায় ফিরে গেছে? একি তার স্বামী সন্তানের ওপর ক্ষোভ ও অভিমানের প্রতিশোধ।

'কুন্দনের বাবা বিত্তশালী। সে একমাত্র পুত্র। তাই তাকে ফিরে যেতে হয়েছে। কিন্তু একমাত্র কন্যার কি মায়ের ওপর কোনও কর্তব্য বা দায়িত্ব নেই? যদি নাই থাকবে তাহ'লে দু'জনেরই থাকবেনা। না, ছেলেদের সব আছে আর মেয়েদের সব ফাঁকি। এনার অবশ্য অন্য একটা দিকও ছিল। সেটা আমি একেবারে উপেক্ষা করতে পারিনি। বলেছিল—আমি ইচ্ছে করলে কুন্দনকে এখানে রাখতে পারি। কিন্তু আরেকজন আমেরিকানের সংখ্যা বাড়াবো না। আমাদের সন্তান আমেরিকান হোক এ আমি চাইনা মাম্মী। ও ফিরে যাবে। ভারতীয় হবে। ভারতবর্ষকে বলবে ঃ আমার মা ভুল করেছিল, আমি শুধরে নিলাম। কিন্তু সব চেয়ে দুঃখের কি জানো দিদি, মেয়েমানুষ মেয়েমানুষই। এতো দাপট দেখিয়ে এনা শেষ রক্ষা করলো না। ওখানে কেউ জানালো না এনার শরীরে ভারতীয় রক্ত। ও বালীর মেয়ে হয়ে ভারতে ফিরে যায়নি। গর্বিত ব্রিটোফারের প্রতিনিধি হয়েই কালোর দেশে গেছে।

বড়বিল গিয়েছিল ওরা বেড়াতে, আমাকে অনেক ছবি পাঠিয়েছে। তোদের বাড়ীটাও আছে। দেখাবো। কিন্তু কাকাবাবু নেই। জানিস ওরা ভাল করে আমার মায়ের খোঁজ করেনি। চতুর মেয়ে ওখানে গিয়ে আমার মন রেখেছে আর মার খোঁজ না করে ওর মান রেখেছে। স্বামীর ঘরের সামান্য সুখের জন্য আমার পরিচয়টা পর্যন্ত ও গোপন করলো। আসলে কি জানিস দিদি, ওতো জাতে আমেরিকান ; মুখে যতো দম্ভই করুক না কেন, রক্ত ওর বেইমানী করেনি। পাছে ওই সমাজে ও আছুৎ হয়ে যায়, তাই মার খোঁজ ওরা করেনি।'

কাছে এসে ওর মাথায় হাত রেখে বল্লাম 'তুই কবে ঘর ছেড়েছিস মনে আছে বালী? আজ একত্রিশ বছর হ'ল। তোর মার বেঁচে না থাকারই তো কথা। কেন এনাকে অবিশ্বাস করে কষ্ট পাচ্ছিস?' 'কিন্তু তুই যে বল্লি কাকীমা বেঁচে আছে?' 'হ্যাঁ, আছে,

তুই জানিস না, আমার মায়েদের অনেক আয়ু। দিদিমা গেছেন নিরানব্বই বছর বয়সে, একটা বছরের জন্য সেঞ্চুরী করতে পারেন নি, বড় মাসীমা নব্বুই, সেদিক দিয়ে মা তো মাত্র পঁচাত্তর। কিন্তু আমার অন্য কাকীমারা কেউ বেঁচে নেই।' লম্বা করে একটা শ্বাস টেনে বালী বললো, 'হয়তো তোর কথাই ঠিক দিদি। এনাকে অবিশ্বাস করে আমি অনেক কষ্ট পেয়েছি। অবশ্য ওতো মিথ্যে কথা বলবার মেয়ে নয়। চিরদিনই তো স্পষ্ট-বক্তা ছিল। তবুও আজ আমি নিজে মা, সন্তান থেকে দূরে বুঝতে পারি সেদিন আমাকে হারিয়ে আমার মায়ের বেদনা কতো গভীর, কতো মর্মান্তিক ছিল ; তার ওপরে ছিল লজ্জা আর অপমান। আমার কালে ঘর ছেড়ে পালানোর একটাই অর্থ হতো, ঘর ছাড়বার সময় না বুঝলেও পরে সবই বুঝেছি।' 'বালী আমার গলা তো শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। ঠাণ্ডা কিছু বের কর।' ওকে একটু আনমনা করতে চাইলাম আমি। 'ছি ছি, কি লজ্জা বলতো, তোমাকে পেয়ে আমার সব গুলিয়ে গেছে।,

দুটো বড় গেলাসে বরফ কুচি দিয়ে লেমোনেড্ নিয়ে এলো। দু'জনেই চুমুক দিয়ে একটু নড়ে চড়ে বসলাম। ওর অফিস কতো দূর, কাজের সময় কতোক্ষণ অফিসের সঙ্গী-সঙ্গিনীরা কেমন এসব প্রসঙ্গ তুলে ওকে একটু মুক্তি দিলাম। ও' ও যেন একটু নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো। অনর্গল সব বর্ণনা দিয়ে চললো। আমার মনে হ'ল. ছোট-বেলায় বালী নিজের মনেই বকে যেতো, ওর কথা তখন অর্ধেক বুঝতে পারতাম অর্ধেক দুর্বোধ্য রয়ে যেতো। তাতে ওর পরোয়া ছিল না, শোন আর নাই শোন, ও শুনিয়েই খুশী। আমি চোখ বন্ধ করে ওর ধারাবর্ণনা শুনে চল্লাম। কিন্তু না, স্রোতস্বিনীকে আটকাতে পারলাম না। হঠাৎ করে বলে বসলো, 'জানিস দিদি, আমি ক্যাম্পেল সাহেবকে, ফ্রিম্যান সাহেবকে, রোষজারিও সাহেবকে, কাকা বাবুকে চিঠি লিখেছি। ভদ্রতার খাতিরে সবাই জবাব দিয়েছেন। কিন্তু তাতে বড়বিলের খবর থাকলেও বালীর মার মতো এক হতভাগিনী কোল রমণীর কথা লেখা নেই।' সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলাম না। কারণ মৃতের শোকে সান্ত্বনা দেয়া যায়। জীবিতের শোক উপশমের কি ভাষা আছে ? হঠাৎ বললো, 'আচ্ছা দিদি, আজ তিন দিন তো সমানে আমার কথা শুনলি। তোর কথা এবারে বল।'

'আমি তো তোকে আগেই বলেছি, আমিও তোর মতো সবাইকে ছেড়ে ক্রিটোফারের মতো এক অপরিচিত পরিবেশের সঙ্গে ঘর বেঁধেছি। দেশ, বাবা, মা, আত্মীয় স্বজন সব ছাড়তে হয়েছে বালী। তবে আমার অবস্থানের ভৌগোলিক দূরত্ব ছিল কম। তাই আবার সবাইকে ফিরে পেয়েছি। কিন্তু যে ফাটল ধরেছিল প্রথম দিকে তা জোড়া লাগলেও ভাঙ্গার চিহ্ন রয়ে গেছে। আমার পাঁচ মেয়ে, দু'জন গৃহিণী, বাকী সবাই ছাত্রী। নিজে চাকুরী করি আর ওই লোকটি চাকুরী ছেড়ে স্বাধীন পেশা নিয়ে খুশীই আছে। পড়াশুনা করি, পড়াই, সুযোগ পেলে দেশ-বিদেশ ঘুরি। আর মেয়েদের অবস্থা উপলব্ধি করতে চেষ্টা করি। একা থাকতে চাইনা, পিছন ফিরতে ইচ্ছে করে না। কারণ তাহলে তোর মতো ফেলে আসা স্মৃতি আমাকে পাগল করে তুলবে। একদিন যৌবনের উন্মাদনায় এক ভালবাসাকে আঁকড়ে ধরতে সব ছেড়েছিলাম, পেছন ফিরে তাকাইনি। আজ সে উন্মাদনা নেই, আবেগ স্তিমিত। তাই হারানোর ব্যথায় আজ আমি ক্লান্ত বালী। ভাবতে পারিনা বালী আমি কেমন করে বাবাকে, মাকে সবাইকে ফেলে একজন সম্পূর্ণ অপরিচিতের হাত ধরে তার চেয়েও এক অজানা জগতে পা দিয়েছিলাম। আজ পর্যন্ত চলছে আমার মানিয়ে নেবার সংগ্রাম। জানিস বালী, শুধু স্বামীকে নিয়ে সংসার গড়া যায় না। তার আপনজন, আত্মীয় স্বজন, ধর্ম, সংস্কৃতি, পরিবেশ সব কিছুই আস্তে আস্তে এসে ওই ছোট্ট সংসারের দোড়গোড়ায় উঁকি দেয়। তারপর ঘটে তার অনুপ্রবেশ। প্রথম বাঁধ ভাঙ্গা প্রেমের জোয়ার ও উন্মাদনায় যখন ভাঁটার টান অনুভূত হয় বাস্তব পরিবেশ তখন এগিয়ে আসে অতি সচেতনতা নিয়ে।

ধীরে ধীরে সন্তান বড় হয়। একটা মিশ্র সংস্কৃতির দোলায় তারা দুলতে থাকে। এখানে মায়ের ভূমিকা কল্পনা কর, কোন্ ধর্ম, কোন্ কৃষ্টি, কোন্ আচার ব্যবহার তার আপন, তার নিজস্ব— এপথ তো মাকে দেখাতে হবে। মা বোঝায়, বাবার সবকিছুই উত্তরাধিকার সূত্রে তোমাদের প্রাপ্য। মায়ের কথা ভুলে যাও। সন্তান তখন দ্বিগুণ উৎসাহে নিষিদ্ধ মায়ের পরিবেশে জোর করে ঢুকতে চায়। ফলে সমাজের কাছে তারা উপহাসের পাত্র হয়। মনে পড়ে বহুদিন আগে আমাদের পরিবারের ঘনিষ্ঠ এক জার্মান বন্ধু

বাঙ্গালী মেয়ে বিয়ে করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। জানিস তো বাবা ছিলেন আমাদের বন্ধুর মতো। বাবা তাকে বলেছিলেন, বাঙ্গালী মেয়ে বিয়ে করে নিঃসন্দেহে তুমি সুখী হবে। কিন্তু একবার তোমার সন্তান-সন্ততির কথা চিন্তা করো। তারা হবে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। স্বভাবে তারা দু'জনের দোষগুলোই পাবে। কারও গুণাবলীই তাদের স্পর্শ করবে না। এ কঠিন সত্য যে অতোটা না হলেও আমার ওপর প্রযোজ্য হবে সেদিন তা ভাবিনি। সন্তানদের খুব কষ্ট হয় বালী।'

'এটা কি শুধু তোর কথা বলছিস দিদি ?' 'শুধু একা আমার কথা কেন আমার তোর সবার।' দ্রুত জবাব দিলাম বালীকে। বালী হেসে বললো, 'না দিদি, আমার কিন্তু ওরকম কোনও অসুবিধা হয়নি। কারণ তোর মতো আমার কোনও পৃথক ব্যক্তিসত্তা বা ব্যক্তিত্ববোধ ছিল না। নিজের ধর্ম বা সংস্কৃতি সম্পর্কে আমি এতোটুকুও সচেতন ছিলাম না। তাই দু'হাতে শুধু আঁকড়ে ধরেছি। ছাড়তে হয়নি কিছু। ক্রিটোফার আমাকে লেখাপড়া শিখিয়েছে। চলতে, বলতে, খেতে, নাচতে, গাইতে, বাজাতে সবই শিখিয়েছে। হ্যাঁ, একটা কথা ঠিক, যখন সব শিখে ব্যক্তিত্ব অর্জন করলাম, তখন মানুষটা হারিয়ে গেল। একটা মুখোমুখী সংঘর্ষের সুযোগও পেলাম না।'

এবারে আমার হাসবার পালা, 'সংঘর্ষ, সংঘাত—এগুলো তোর মুখস্থ করা শব্দরে বালী। ক্রিটোফারের গায়ের শব্দ শুনবার জন্য তুই তো কান পেতে আছিস।' 'না দিদি, আজ আর সে-কথা সত্য নয়। ক্রিটোফার চলে গেলেও দেহ আমার উপবাসী থাকেনি, কিন্তু মনটা নিয়ে আর ছিনিমিনি খেলতে আমি রাজী নই। ক্রিটোফার আমাকে মনের মত করে একজন আমেরিকান মহিলা হিসেবে গড়েছিল। ও সার্থক দিদি, আমি মনে প্রাণে আজ আমেরিকান। আমার সংস্কার মুক্তি ঘটেছে।' আবেগে বলে গেল বালী।

ওর পিঠে একটা থাপ্পড় দিয়ে বল্লাম, 'রাজনীতি করিস নাকি ? বেশ তো বক্তৃতা দিতে শিখেছিস। ক্রিটোফার আবার আসবে আমি জানি, কারণ শেষ বয়সে পুরুষ নোঙ্গর ফেলতে চায়। জানিস ওর দু'দুটো বউ টেকেনি কেন ? সে তোর জন্যে, ভারতীয় মেয়ের স্বামীভক্তি আর স্বামী সেবা ও পাবে কোন ইয়াঙ্কি মহিলার

কাছে ! এখানে বৌ-এর রান্না খেতে হলে হাঁড়ি ধুতে হয়। ছেলের দুধ যদি মা তৈরী করে বাবা করে বোতল পরিষ্কার। ওজনে মাপা প্রেমে ক্রিটোফারের মন ভরবে নারে।' 'মন ?' তীক্ষ্ণ প্রতিবাদী কণ্ঠ বালীর, 'মন ব'লে কোনও পদার্থ পুরুষের আছে নাকি ? ক্রিটোফারের কাছে আমি ছিলাম ইবসেনের নোরার মত একটা খেলার পুতুল। আমার প্রতি একটা মমতা, অনুকম্পা থেকে ওর মোহ জন্মেছিল আর কিছু নয়।'

এবারে বালী আমাকে ভাবিয়ে তুললো। সত্যিই কি তাই ? শুধু এদেশে কেন আমার দেশেও অতি উচ্চ শিক্ষিত দম্পতির প্রেম করে বিয়ে করা ঘরে দু'তিনটি সন্তানের অবস্থানকে ধূলোয় লুটিয়ে দিয়ে ভেঙ্গে যাচ্ছে কতো অনায়াসে। শুধু পুরুষের অপরাধ কি করে বলি ? মঞ্চে অন্যনারী না থাকলে নাটক হয় কি করে। মেয়েরাও তো সন্তান ছেড়ে চলে যাচ্ছে নতুন ভালবাসার অন্বেষায়। তাহলে নরনারীর প্রেম বলতে কি কিছু নেই ? লায়লা-মজনু, শিঁরী-ফরহাদ কি শুধু কাব্যের কথা। মনে হয় তাই। বাস্তবে কবিরা যা পাননি কল্পনায় তারই আস্বাদন করেছেন। 'এমন হলে ভাল হয়'—এই অনুভূতি নিয়েই কি এসব চরিত্র চিত্রণ ! মেঘদূতের বিরহ কি শুধু যক্ষ-পত্নীর জন্য, না তার মর্মর প্রাসাদে সুখশয্যালীন অপরূপা কামিনীর দেহ ভোগের জন্য। সত্যিই দেহ-ছাড়া প্রেমই চিরস্থায়ী হ'তে পারে। দেহকে অবলম্বন করে যে প্রেম গড়ে ওঠে তার আধার অনায়াসে পরিবর্তিত হতে পারে। পারে নয়, তাইতো হচ্ছে আমাদের সমাজজীবনে। সবাই পুতুল খেলায় মেতেছে। জীবনে অর্থ বিত্ত প্রতিপত্তি আর নারীর প্রয়োজন। উন্মত্ত পুরুষের ভোগের বিলাস শুধু নারী নয়, বিলাসিনী হয়ে সেও তো সুখ পায়, না হ'লে ঘাটে ঘাটে নৌকা বাঁধে কেন ? যে নৌকা জোয়ারে তীরে আসে আবার ভাঁটার টানে মাঝ দরিয়ায় ভাসে। জানি, এসব কথা ভাবলে ঘর অরণ্য হয়ে ওঠে। ভাবি, যেটুকু তথাকথিত কুসংস্কার নিয়ে আমরা ঘরটাকে বেঁধে রাখলাম, আমাদের সন্তানেরা নিঃসন্দেহে তার থেকে মুক্ত হয়ে ভাসার আনন্দ ভোগ করবে। শুধু পরবর্তী প্রজন্মে পৃথিবীতে মানুষ নামে মানুষ থাকবে না, থাকবে এক শ্রেণীর ওই নামের পশু।

বালী আমাকে একটা ধাক্কা দিল, 'কি এতো ভাবছিস' ? 'না' কিছুনা, চল্ উঠি,' বলে উঠে দাঁড়ালাম। বালী বিস্মিত, 'সেকি ? তুইতো রাতে খেয়ে যাবি। তোর ওই সুন্দরীকেও তো খেতে বলেছি। 'ওঃ তাইতো।' লজ্জা পেলাম। পারিপার্শ্বিক ভুলে গিয়েছিলাম। দরজায় টোকা পড়লো। বালী যথারীতি সামান্য ফাঁক করে হেসে যেন কাকে ফিরিয়ে দিল। 'কে রে বালী ?' উত্তর এলো, 'আমার বন্ধু দিদি।' 'ডাকনা. দেখি কেমন বন্ধু তোর।' হাল্কা সুরে ব'ল্লাম পরিবেশ তরল করবার জন্য। এবারে খিল খিল করে হাসির সুর ভাঁজালো বালী, 'কিন্তু কি করে ডাকি বল ? আমার ঘরে তো দু'বন্ধুর জায়গা একসঙ্গে হয় না দিদি।' 'অসভ্য কোথাকার, তোর বয়েস হয়নি ? এখনও এসব বাজে কথা বলিস ?' 'কেন আমাকে দেখে কি বুড়ী মনে হয় ?' সাগ্রহে জিজ্ঞেস করে বালী। হঠাৎ এসে আমাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বলে, 'তোর হিংসে হয়েছে দিদি, সিম্পল এ্যাণ্ড প্লেন হিংসে।' 'হিংসে কিসের রে ? আমার কি তোর মতো দোকান সাজাতে হয় নাকি ?' ঝামটা মেরে উত্তর দিলাম। 'সাজাবি কি দিয়ে ?' এবারে ওর মুখটা চেপে ধরলাম। জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। কনে দেখা হলুদ আলোটুকু মরে এসেছে সাগর উপকূলে। বিরাট রক্তপিণ্ড কাশ্যপ মুনির পুত্র ঘরে ফিরবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ব'ল্লাম, 'চল বালী একটু বাইরে বেড়িয়ে আসি।' হঠাৎ দৃপ্ত কণ্ঠে বালী বললো, 'না, পাগলামী করিস না। বোস তো ঠাণ্ডা হয়ে। আজ তুই আমার ঘরে বন্দী। বল্ কি খাবি, ঠাণ্ডা না গরম।' বুঝলাম দিনের আলো সরে গেছে। সন্ধ্যায় বালী ঘরের বাইরে যেতে চায়না। যদি কেউ আশ্রয় চায়। ব'ল্লাম, 'ঠাণ্ডাই দে।' এক ঝটকায় দরজা খুলে ওর বাগানে এসে দাঁড়ালাম।

আ, শরীরটা জুড়িয়ে গেল। ঠাণ্ডা সমুদ্রের হাওয়া আছে। এই তো শান্তি, এই তো তৃপ্তি। ধরিত্রীতো আছেন সবার জন্য। বালীরও কিসের কষ্ট। এমন সুন্দর নিঃসর্গের শোভা আছে তার জন্য উদার হাত প্রসারিত করে, কতো রকমের ফুল ওর বাগানে। এরাই তো সন্তান। ঢাকায় আমার বাসায় বছরে সাত আট দিনের জন্যে তিনটে আর্কিডে ফুল ফোটে ; প্রতিবারই যেদিন সকালে উঠে প্রথম ফোটা ফুল দেখি, আমার আনন্দের সীমা থাকেনা। সারা বছর জল ঢালবার

দুঃখ চলে যায়। বাইরে হাল্কা চেয়ার নিয়ে এলো বালী। আপত্তি করলাম না। অনেক কথা বলেছি। দু'জনেই চুপ করে বসে রইলাম কিছুক্ষণ।

আটটা নাগাদ এ্যান এলো। ভালই খাওয়া দাওয়া হ'ল। এ্যান খুব খুশী আজকে। কয়েকটা ডলার বেঁচে গেল ওর। সাড়ে এগারটা নাগাদ হোটেলে ফিরে এলাম। বালীই পৌঁছে দিয়ে গেল। কাল সকালে ফ্লাইট সাড়ে এগারটায়। বালী দশটায় আসবে আমাদের এয়ার পোর্টে নিয়ে যাবে।

সারাটা রাত ঘুম হ'ল না। আধা জাগা অবস্থায় স্বপ্ন দেখলাম বড়বিল, ঠাকুরাণী পাহাড়, জঙ্গল, হাতি, লোহার খনি, ম্যাঙ্গানীজের স্তূপ আর অসংখ্য ময়ূর। স্বপ্নের ময়ূরেরা পেখম তুলে নাচছে। আর দূরে দাঁড়িয়ে বালী কাঁদছে।

এ্যান দরজায় টোকা দিলো। লাফিয়ে উঠলাম। সকাল ন'টা। দশটায় বালী আসবে। তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে ডাইনিং হলে গেলাম। এ্যান সামনে আধখানা আনারস নিয়ে কসরৎ করছে। হেসে 'সুপ্রভাত' জানালো। ওর আম আর আনারসের পালা আজই শেষ। দু'জনেই চুপচাপ খাওয়া সারলাম। আজ দু'মাস হ'ল ঘর ছেড়েছি। মন এখন গৃহমুখী। তবুও আজ হাওয়াই ছেড়ে যেতে কোথায় যেন একটা কাঁটার বেদনা অনুভব করছি।

ঠিক দশটায় বালী এসে গেল। সুরুচি সম্পন্ন স্কার্ট, ব্লাউজ পরা। গলায় একটা টাট্‌কা ফুলের মালা। ওর খোলা চুলে কানের কাছে ব্লাউজের রঙে ম্যাচ্ করা একটা বড় ফুল। মনে হচ্ছে সদ্যস্নাত সাগর কুমারী, পবিত্রতার প্রতীক। মুক্তোর মত দাঁত বের করে এক ঝলক সকালের রোদের মত হাসির ঝিলিক ছড়িয়ে দিল। 'বাব্বাঃ একেবারে তৈরী। যাবার জন্যে পাগল হয়ে গেছিস। আর দু'টো দিন থেকে যা না দিদি।' কি মিনতি কণ্ঠস্বরে। কাল রাতে গলা জড়িয়ে ধরে এ কথাটাই বলেছিল। উত্তরে বলেছিলাম, 'লণ্ডনে সুদূর প্রবাসে আমার মেয়ে দুটো আমার পথ চেয়ে আছে বালী। সময় তো এখানেই কাটিয়ে গেলাম, ওদের কাছেও সপ্তাহ খানেকের বেশী থাকা হবে না। দীর্ঘ পথের সব ফ্লাইট বক করা, এ শেকল ভাঙ্গা শক্ত।'

এগিয়ে এলো বালী, আমার সুটকেস আর হ্যাণ্ডব্যাগটা ক্যারিয়ারে তুললো। সামনে এ্যানের সুটকেস, ও দাঁড়িয়ে আছে। ভেবেছিল বালী তুলবে ওটা গাড়ীতে, না হাওয়াই দ্বীপের বালী কেন সাদা চামড়ার সুট-কেস তুলবে। এ্যান তার সুটকেসটা তুলতেই বালী কেরিয়ার বন্ধ করে দিল। আমি ওর পাশে বসা, এ্যান পেছনে, কারো মুখেই কথা নেই। এ্যান মাঝে মাঝে এটা ওটা জিজ্ঞেস করছে। বালী অতি সংক্ষিপ্ত জবাব দিচ্ছে। প্রায় কুড়ি মিনিটে আমরা বিমান বন্দরে এলাম।

যথারীতি লাগেজ ঢুকিয়ে দেখলাম তখনও প্রায় আধ ঘন্টা বাকী। বালী বললো, 'চলো লাউঞ্জে বসি।' লাউঞ্জে আসতেই বালী ড্রিংকসের উদ্দেশ্যে পা বাড়ালো। এ্যান বাধা দিল। বালী মেনে নিলো। কারণ কাল রাতের ডিনারের আংশিক প্রতিদান। বালী আমার পাশে বসেছে। কখন যেনো আমার হাতটাকে হাতের ভেতর নিয়েছে। যাত্রা ঘোষণা শুনলাম, উঠে দাঁড়ালাম। বালীকে জড়িয়ে ধরে একটা চুমু খেলাম। ও আমার একটা হাত এতো শক্ত করে ধরেছে যে আমার ব্যথা লাগছে। হয়ত জন্মভূমির শেষ স্পর্শটুকু ও নিঃশেষ করে নিতে চায়। আমার দু'চোখে বন্যা, ওর দিকে তাকালাম না। দ্রুতপায়ে ভেতরে ঢুকলাম। শেষবার তাকিয়ে দেখি, বালী শান্ত, স্নিগ্ধ, হাসিভরা মুখে হাত নাড়ছে, যেমন করে একদিন হাত নেড়ে ছিল ক্রিটোফারকে আর এনা কুন্দনকে। ও জানে ওই হাত নেড়ে সবাইকে বিদায় দেবে। এ দ্বীপ ওর জন্ম জন্মান্তরের বাসস্থান। এই ওর ভাগ্যলিপি, বিধাতাপুরুষের বিধান।

প্লেন ছেড়ে দিয়েছে। নীচের সমুদ্রের স্পন্দন আমার বুকে। এই দ্বীপই ছিল আমার যুক্তরাষ্ট্রের শেষ সফর স্থান। এবারে ওয়াশিং-টন হয়ে ঘরে ফিরবো। মুখ বাড়িয়ে সৈকতভূমি দেখলাম—সেই বনরাজিনীলাখচিত লবণাম্বুরাশি, যেখানে বালীর চোখের জল প্রতি নিয়ত মিশে চলেছে। আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো ওই তীরে দাঁড়ানো একটি কোল মেয়ে—ক্ষীণ স্বাস্থ্য, পনেরো ষোল বছর বয়স। কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত এক টুকরো কাপড় জড়ানো, উর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত, যৌবন সবে দেহকে স্পর্শ করেছে, ভাল করে জানান দেয়নি ; গলায় পুঁতির মালা, ধূলি ধূসরিত রুক্ষ চুলে জবা ফুল গোঁজা। মুছে গেল হাওয়াইয়ের বালী আমার চোখের সামনে

থেকে। এয়ার হোস্টেসের ডাকে চমক ভাঙ্গলো---কি পানীয় চাই, তার উত্তরের অপেক্ষায় আছে সুন্দরী বিমানবালা।

বহু পথ ঘুরে, বহুজনের হৃদয় ছুঁয়ে লণ্ডনে সপ্তাহ দুই মেয়েদের কাছে কাটিয়ে দেশে ফিরলাম। লণ্ডনে বসেই এনার কাছে দীর্ঘ চিঠি লিখেছিলাম। ঢাকায় ফিরে সুদৃশ্য লেটার প্যাডে জবাব পেলাম। প্রচুর আবেগ আর উচ্ছ্বাস মিশিয়ে মায়ের কথা লিখেছে এনা। এমন মা হয়না, মায়ের ভালবাসা, কর্তব্যনিষ্ঠা, বেদনা সব কিছুই উল্লেখ করেছে এনা। তবে আমাকে ইঙ্গিতে সতর্ক করে দিয়েছে, আমি যদি ওদের ওখানে যাই তবে যেন মায়ের পূর্ব-পরিচয়ের কথা কিছু না বলি। সবাই এখানে জানে মা আমেরিকান, হাওয়াই দ্বীপের মেয়ে। ভারতের উচ্চ বর্ণের ঘরে কোল-রমণীর সন্তানের জায়গা নাও মিলতে পারে। তাছাড়া মা যখন কখনও আর দেশে আসবেই না তখন শুধু শুধু ঝুট-ঝামেলা না বাড়ানোই ভাল। অজস্র প্রশ্ন আমার মনের দরজায়। একজন পৃথিবীর ওপারে, আর একজন এপারে। প্রেমিকের হাত ধরে যাত্রা শুরু। একজন মা নিঃস্ব রিক্ত, আরেকজন ? ---জানিনা তার সুখ, সংসার আর ভবিষ্যতের কথা।

ইদানীং তার চিঠিতে বেদনার আভাস। স্বামী পুত্র নিয়ে ও সুখেই আছে। দু'জনেই বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরী করে কিন্তু সুখ স্বস্তিকে ভুলতে বসেছে। ও লিখেছে, মাসী আমি সার সত্য এটুকুই বুঝেছি, এদেশে এ ঘর ভাঙলে দ্বিতীয় ঘর মিলবে না। মায়ের মত দর্পিত ভঙ্গীতে একা থাকাও চলবে না। তাই জীবনটাকে স্বস্থির ভিতর দিয়ে কাটিয়ে দেওয়াটাই বুদ্ধির কাজ। তুমি কি বলো ?

কি বলবো আমি এনা ? কীই-বা বলতে পারি ? নারী-দশকের শেষ বছরে এসে শুধু বলবো, মানিয়ে নাও, রক্ত ঝরাও, নীরবে কাঁদ, বিদ্রোহ করবার মত দুঃখ ও যন্ত্রণা সইবার শক্তি যদি তোমার না থাকে, আত্মসমর্পণ কর। মাথা উঁচু করে চলবার জায়গা এ দেশের মাটি নয়। এখানে বালী তোমাকে পরাজিত করেছে। সে আলোর দিকে ছুটেছে পতঙ্গের মত। পুড়ে মরলেও তার সুখ, কারণ সে নিজের ইচ্ছাকে জয়ী করেছে। উচ্চশিক্ষিত এনা, তোমার জন্য কোন্ ঠিকানা অপেক্ষা করে আছে---কোন্ দেশের মাটি ? সেই ঠিকানা খুজতে পাঁচটা মহাদেশ ঘুরে আজও তা খুঁজে পাইনি।

আজও আমরা অন্যের ইচ্ছার পুতুল। তবে আমার খোঁজা শেষ হয় নি, হয়ত হবেও না কোনদিন। তুমি আমাকে ডেকোনা। তোমাদের সুখের সংসারে যেতে পারলে খুশী হ'তাম। কিন্তু তোমাদের হাসির আড়ালের অশ্রু আমি উপলব্ধি করি, আলোর সীমারেখার পাশে অন্ধকার। ব্যক্তিত্ব আর স্বস্তির সংঘাতে তোমরা ব্যথা কাতর---নিজেদের পথ নিজেরাই খুঁজে নাও। এ পথের সন্ধান তোমার নিজস্ব জীবন-দর্শন। সুখ দুঃখ ভালমন্দ সেখানেই একত্রীভূত। অভিশাপ মুক্ত হও। আমি আর বালী আজ অতীত। তোমরা বর্তমান। তোমাদের কাছে আমাদের অপ্রাপনীয়কে পাবার প্রত্যাশা!